ব হ্নি - প ত ঙ্গ

এক

'পটনায় পৌঁছিয়া দশ-বারো দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। তারপর একদিন পুরন্দর পাণ্ডের সহিত দেখা হইয়া গেল। পাণ্ডেজি বছরখানেক হইল বদলি হইয়া পাটনায় আসিয়াছেন। সেই যে দুর্গরহস্য সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তারপর আর দেখা হয় নাই। পাণ্ডেজি খুশি হইলেন, আমরাও কম খুশি হইলাম না। পাণ্ডেজি মৃত্যু-রহস্যের অগ্রদূত, আমাদের সহিত দেখা হইবার দু' একদিন পরেই একটি রহস্যময় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং—'

আদিম রিপুতে যে মৃত্যু-রহস্যের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহাই এখন সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিতেছি।—

একদিন সন্ধ্যার পর পাণ্ডেজির বাসায় আড্ডা বসিয়াছিল। বাহিরের লোক কেহ ছিল না, কেবল ব্যোমকেশ, পাণ্ডেজি ও আমি। চা, কাবুলী মটরের ঘুগ্‌নি, মনেরে'র লাড্ডু এবং গয়ার তামাক—এই চতুর্বর্গের সহযোগে পুরাতন স্মৃতিকথার রোমন্থন চলিতেছিল। ভৃত্য মাঝে মাঝে আসিয়া গড়গড়ার কলিকা বদলাইয়া দিয়া যাইতেছিল।

পাণ্ডেজির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে প্রায় রোজই আমাদের আড্ডা জমিতেছে, কখনও আমাদের বাসায়, কখনও পাণ্ডেজির বাসায়। আজ পাণ্ডেজির বাসায় আড্ডা জমিয়াছে। তিনি আগামীকল্য আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা খাওয়াইবেন। আমাদের কর্মহীন পাটনা প্রবাস মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

পাটনায় বদ্‌লি হইয়া পাণ্ডেজির পদোন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিলাম তাঁহার চিত্তে সুখ নাই। মহাযুদ্ধের চিতা নিভিলেও আকাশ বাতাস চিতাভস্মে আচ্ছন্ন, তদুপরি স্বাধীনতার প্রসব যন্ত্রণা। আমাদের স্মৃতি-রোমন্থন ঐতিহাসিক রীতিতে বর্তমান কালে নামিয়া আসিল। পাণ্ডেজি সাম্প্রতিক কয়েকটি লোমহর্ষণ সত্যঘটনা আমাদের শুনাইলেন। অবশেষে বলিলেন,—

'এই মহাযুদ্ধের সময় থেকে পৃথিবীতে ঠগ-জোচ্চোর-খুন-বদমায়েসের সংখ্যা বেড়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিসেরও কাজ বেড়েছে। আগে যে-সব অপরাধ আমরা কল্পনা করতাম না সেইসব অপরাধ নিত্য-নিয়ত ঘটছে। বিদেশী সিপাহিরা এসে নানা রকম বিজাতীয় বজ্জাতি শিখিয়ে গেছে। কত রকম নেশার জিনিস, কত রকম বিষ যে দেশে ঢুকেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। এই সেদিন পাটনার এক অতি সাধারণ ছিঁচকে চোরের কাছ থেকে এক শিশি ওষুধ বেরুল, পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা একটা সাংঘাতিক বিষ, দক্ষিণ আমেরিকায় তার জন্মস্থান।'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল মুখের নিকট হইতে সরাইয়া অলস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী বিষ ? কিউরারি ?'

'হ্যাঁ। আপনি নাম জানেন দেখছি। এমন সাংঘাতিক বিষ যে রক্তের সঙ্গে এক বিন্দু মিশলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। যে শিশিটা পাওয়া গেছে তা দিয়ে সমস্ত পাটনা শহরটাকে শেষ করে দেওয়া যাবে। ভেবে দেখুন এই রকম কত শিশি আমদানি হয়েছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও বিষটা কোথাও ব্যবহার হয়েছে তার প্রমাণ পেয়েছেন নাকি ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমাদের দেশে কোথায় কাকে বিষ খাইয়ে মারা হচ্ছে সব খবর কি পুলিসের কানে পৌঁছয় ? মড়া পোড়াবার জন্য একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট পর্যন্ত দরকার হয় না। নেহাৎ যারা গণ্যমান্য লোক তাদের বিষ খাওয়ালে হয়তো হৈ-চৈ হয়। তাও আত্মীয়-স্বজনেরা চাপা দিয়ে দেয়। অথচ আমার বিশ্বাস এ দেশে বিষ খাইয়ে মারার সংখ্যা খুব কম নয়।'

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিয়া বলিল, 'আচ্ছা, আপনারা যে এই সব বিষ আর মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেন কোথায় যায় বলুন তো ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কোথায় আর যাবে ? কিছুদিন আমাদের কাছে থাকে, তারপর হেড অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাঁরা ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সে কতটুকু ? বেশির ভাগই তো চোরাবাজারে চারিয়ে আছে। যার দরকার সে কিনে ব্যবহার করছে।' পাণ্ডেজি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন—'যুদ্ধ আর রাষ্ট্রবিপ্লব সভ্য মানুষকে অসভ্য করে তোলে। তখন বিবেক বুদ্ধির মুখোশ পড়ে খসে, কাঁচা-খেকো জানোয়ারটি বেরিয়ে আসে। কী ঠুনকো আমাদের সভ্যতা। আসলে আমরা বর্বর।'

ব্যোমকেশ কথাটা যেন একটু তলাইয়া দেখিয়া বলিল, 'আসলে আমরা বর্বরই বটে। কিন্তু যখন সভ্যতা থেকে বর্বরতায় ফিরে যাই তখন সভ্যতার একটা গুণ সঙ্গে নিয়ে যাই। মুখোশ অত সহজে খসে না পাণ্ডেজি, কাঁচা-খেকো জন্তুটিকে খুঁজে বার করতে সময় লাগে। বাইরে শান্ত শিষ্ট নিরীহ জীব আর ভিতরে তীক্ষ্ণ নখ দন্ত—এইটেই সবচেয়ে ভয়াবহ।'

ঘড়িতে আটটা বাজিল। শীতের রাত্রি, কিন্তু আমাদের গৃহে ফিরিবার বিশেষ তাড়া ছিল না। তাই পাণ্ডেজি যখন আর এক কিস্তি চায়ের প্রস্তাব করিলেন তখন আমরা আপত্তি করিলাম না। এই সময় ভৃত্য প্রবেশ করিয়া বলিল, 'ইন্সপেক্টর চৌধুরী এসেছেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কে রতিকান্ত ? নিয়ে এস।—আর চার পেয়ালা চা তৈরি কর।'

ভৃত্য চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে পুলিসের পোশাক পরা একটি যুবক প্রবেশ করিল। দীর্ঘ-দৃঢ় আকৃতি, টক্‌টকে রঙ, কাটালো মুখ, নীল চোখ, হঠাৎ সাহেব বলিয়া ভ্রম হয়। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। সে আসিয়া স্যালুটের ভঙ্গীতে ডান হাতটা একবার তুলিয়া পাণ্ডেজির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কি খবর, রতিকান্ত ?'

রতিকান্ত বলিল, 'হুজুর, একটা নেমন্তন্ন চিঠি আছে।' বলিয়া ওভারকোটের পকেট হইতে একটি খাম বাহির করিল। রতিকান্তর ভাষা উত্তর ভারতের বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষা, বিহারের ভেজাল হিন্দী নয়।

পাণ্ডেজি স্মিতমুখে বলিলেন, 'কিসের নেমন্তন্ন ? তোমার বিয়ে নাকি ?'

রতিকান্ত করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'আমার বিয়ে কে দেবে হুজুর ? দীপানারায়ণ সিং নেমন্তন্ন করেছেন।'

পাণ্ডেজি খামখানা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'কিন্তু দীপানারায়ণ সিং-এর নেমন্তন্ন চিঠি তুমি নিয়ে এলে যে ?'

রতিকান্ত কৌতুকচ্ছলে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, 'কি করি স্যার, বড়মানুষ কুটুম্ব, কোনদিন মিনিস্টার হয়ে যাবেন, তাই খাতির রাখতে হয়। মাঝে মাঝে যাই সেলাম বাজাতে। আজ গিয়েছিলাম, তা পুলিস অফিসারদের নেমন্তন্ন চিঠিগুলো আমাকেই বিলি করতে দিলেন।'

পাণ্ডেজি খাম হইতে সোনালী জলে ছাপা তক্‌তকে কার্ড বাহির করিয়া পড়িলেন, বলিলেন, 'হুঁ, গুরুতর ব্যাপার দেখছি। রীতিমত ডিনার। —কিন্তু উপলক্ষটা কি ?'

রতিকান্ত বলিল, 'অনেকদিন রোগভোগ করে সেরে উঠেছেন তাই বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াচ্ছেন। শহরের গণ্যমান্য সকলকেই নেমন্তন্ন করেছেন।'

পাণ্ডেজি কার্ডখানা আবার খামে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, 'কাল রাত্তিরে নেমন্তন্ন। কিন্তু আমি তো যেতে পারব না, রতিকান্ত।'

'কেন স্যার, কাল কি আপনি ইন্‌সপেকশনে বেরুচ্ছেন ?'

'না। আমার এই বন্ধুদুটি কলকাতা থেকে এসেছেন, কাল রাত্তিরে ওঁদের খেতে বলেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা।'

রতিকান্ত চকিত হাস্যে আমাদের পানে চাহিল। এতক্ষণ সে থাকিয়া থাকিয়া আমাদের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল ; আমরা তাহার অপরিচিত অথচ পাণ্ডেজির সহিত বসিয়া গড়গড়া টানিতেছি দেখিয়া বোধহয় কৌতূহলী হইয়াছিল, কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করে নাই। এখন হাসিমুখে ডান হাতখানা কপালের কাছে লইয়া গিয়া স্যালুট করিল। তারপর পাণ্ডেজিকে বলিল, 'হুজুর, কাশ্মীরী কোর্মার খবর আগে জানলে আমিও কাল এসে আপনার বাড়িতে আড্ডা গাড়তাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আচ্ছা, আজ চলি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বোসো, চা খেয়ে যাও।'

রতিকান্ত বলিল, 'চা আর একদিন হবে হুজুর। আর, যদি কাশ্মীরী কোর্মা খাওয়ান তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু আজ আর বসতে পারব না। এখনও দু'তিনখানা চিঠি বিলি করতে বাকি আছে। তাছাড়া দীপনারায়ণজিকে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে। নিমন্ত্রণপত্রে আর এস ভি পি লেখা আছে দেখেছেন তো।'

'আচ্ছা, তাহলে এস।'

রতিকান্ত স্মিতমুখে আমাদের সকলকে একসঙ্গে স্যালুট করিয়া চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'বাঃ, খাসা চেহারা ছোকরার ! যেন রাজপুত্তুর !'

পাণ্ডেজি কহিলেন, 'নেহাৎ মিথ্যে বলেননি। ওর পূর্বপুরুষেরা প্রতাপগড়ের মস্ত তালুকদার ছিল। প্রায় রাজারাজড়ার সামিল। এখন অবস্থা একেবারে পড়ে গেছে, তাই রতিকান্তকে চাকরি নিতে হয়েছে। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে ; নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে, বি. এস-সি পাস করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজকাল বড় ঘরের ছেলেরা পুলিসে ঢুকছে এটা সুলক্ষণ বলতে হবে।'

চা আসিল। কিছুক্ষণ অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনার পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'দীপনারায়ণ সিং কে ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং-এর নাম শোনেননি ? বিহারের একজন প্রচণ্ড জমিদার, সালিয়ানা আয় দশ লাখ টাকা, তার ওপর তেজারতির কারবার আছে। লোকটি

কিন্তু ভাল। রাজনৈতিক আন্দোলনে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি—' গড়গড়ায় কয়েকটি টান দিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বয়সে একটি ভুল করে ফেলেছেন, তরুণী ভার্যা গ্রহণ করেছেন।'

'সাবেক গৃহিণী বিদ্যমান ?'

'না, অতটা নয়। সাবেক গৃহিণী বছর কয়েক হল গত হয়েছেন, তারপর তরুণী ভার্যাটি এসেছেন। ভদ্রলোককে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, ছেলেপুলে নেই, এক ভাইপো আছে জমিদারীর শরিক, কিন্তু সেটা ঘোর অপদার্থ। এই রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করবার একটা লোক চাই তো।'

'তাহলে দীপনারায়ণ সিং আবার বিয়ে করে ভুলটা কী করেছেন ? বংশরক্ষা তো হবে।'

'বংশরক্ষা এখনও হয়নি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা দীপনারায়ণ সিং রূপে মুগ্ধ হয়ে জাতের বাইরে বিয়ে করেছেন। সিভিল ম্যারেজ।'

'তরুণীটি বুঝি সুন্দরী ?'

'সুন্দরী এবং বিদুষী। কলানিপুণা, নাচতে গাইতে জানেন, ছবি আঁকতে জানেন, তার ওপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজস্বিনী ছাত্রী, বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

'দীপনারায়ণ সিং দেখছি ভাগ্যবান এবং প্রগতিশীলও বটে।'

'আগে এতটা প্রগতিশীল ছিলেন না। এতদিন ওঁর বাড়িতে মেয়েদের পর্দা ছিল। এখন একেবারে পর্দা ফাঁক।'

'ভালই তো। তাতে দোষটা কি ?'

'দোষ নেই। কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা, কপাল চড় চড় করে। বিহারের লোক এখনও মন থেকে পর্দা প্রথা ত্যাগ করতে পারেনি, তাই মেয়েদের একটু স্বাধীনতা দেখলেই কানাঘুষো করে, চোখ ঠারাঠারি করে—'

অতঃপর আমাদের আলোচনা স্ত্রী-স্বাধীনতার পথ ধরিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে উপনীত হইল। ঘড়ির কাঁটাও ক্রমশ ন'টার দিকে যাইতেছে। রাত্রে বাড়ি ফিরিতে বেশি দেরি করিলে সত্যবতী হাঙ্গামা করে। তাই আমরা অনিচ্ছাভরে উঠিবার উপক্রম করিলাম।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চলুন, আপনাদের মোটরে করে পৌঁছে দিয়ে আসি।' পাণ্ডেজির আগে মোটর সাইকেল ছিল, এখন একটি ছোট মোটর কিনিয়াছেন.।

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। পাণ্ডেজি গিয়া ফোন ধরিলেন—'হ্যালো...হ্যাঁ, আমি পুরন্দর পাণ্ডে...দীপনারায়ণ সিং কথা বলতে চান ?...নমস্তে নমস্তে...আপনার পার্টিতে যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু...বন্ধুদেরও নিয়ে যাব ?...তা—ওঁরা এখনও এখানেই আছেন, ওঁদের জিগ্যেস করে বলছি—'

টেলিফোনের মুখে হাত চাপা দিয়া পাণ্ডেজি আমাদের দিকে ফিরিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং আপনাদেরও পার্টিতে নিয়ে যেতে বলছেন। কি বলেন ?'

ব্যোমকেশ একবার আমার দিকে তাকাইল, বলিল, 'মন্দ কি। একটা নূতনত্ব হবে। আপনার কাশ্মীরী কোর্মা না হয় আপাতত ধামাচাপা রইল।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া টেলিফোনের মধ্যে বলিলেন, 'বেশ, ওঁরা যাবেন...ওঁদের কার্ড আমার কাছেই পাঠিয়ে দেবেন...আচ্ছা, কাল আবার দেখা হবে। নমস্তে।'

পাণ্ডেজি টেলিফোন রাখিয়া বলিলেন, 'চলুন, এবার আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দুই

পরদিন সন্ধ্যা আন্দাজ সাতটার সময় পাণ্ডেজি আসিয়া আমাদের মোটরে তুলিয়া দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে লইয়া গেলেন।

দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ি শহরের প্রাচীন অংশে। সাবেক কালের বিরাট দ্বিতল বাড়ি, জেলখানার মত উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা। আমরা উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বাড়ি ও বাগানে জাপানী ফানুসের ঝাড় জ্বলিতেছে, অতি মৃদু শানাই বাজিতেছে, বহু অতিথির সমাগম হইয়াছে। একতলার বড় হল-ঘরটিতেই সমাগম বেশি, আশেপাশের ঘরগুলিতেও অতিথিরা বসিয়াছেন। কোনও ঘরে ব্রিজের আড্ডা বসিয়াছে, কোনও ঘরে বয়স্থ হাকিম শ্রেণীর অতিথিরা নিজেদের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র গণ্ডী রচনা করিয়া গল্পগুজব করিতেছেন। তকমা আঁটা ভৃত্যেরা চা, কফি ও বলবত্তর পানীয় লইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে।

হল-ঘরটি বৃহৎ, বিলাতি প্রথায় স্থানে স্থানে সোফা-সেট দিয়া সজ্জিত। প্রত্যেক সোফা-সেটে একটি দল বসিয়াছে। ঘরের মধ্যস্থলে সদর দরজার সম্মুখে একটি পালঙ্কের মত আসন। তাহার উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, ইনিই গৃহস্বামী দীপনারায়ণ সিং। গায়ে লম্বা গরম কোট, গলায় পশমের গলাবন্ধ। চেহারা ভাল, পঞ্চাশ বছর বয়সে এমন কিছু স্থবির হইয়া পড়েন নাই, কিন্তু মুখের পাণ্ডুর শীর্ণতা হইতে অনুমান করা যায় দীর্ঘ রোগ-ভোগ করিয়া সম্প্রতি আরোগ্যের পথে পদার্পণ করিয়াছেন। পরম সমাদরে দুই হাতে আমাদের করমর্দন করিলেন।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনার রোগমুক্তির জন্য অভিনন্দন জানাই।'

দীপনারায়ণ শীর্ণ মুখে মিষ্ট হাসিলেন, 'বহুৎ ধন্যবাদ। বাঁচবার আশা ছিল না পাণ্ডেজি, নেহাৎ ডাক্তার পালিত ছিলেন তাই এ যাত্রা বেঁচে গেছি।' বলিয়া ঘরের কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

ঘরের কোণে একটি সোফায় কোট-প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক একাকী বসিয়া ছিলেন; দোহারা গড়ন, বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নাই, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। অঙ্গুলি নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পরিচয় হইল। দীপনারায়ণ সিং বলিলেন, 'এঁরই গুণে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে।'

ডাক্তার পালিত যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারের যা কর্তব্য তার বেশি তো কিছুই করিনি।—তাছাড়া, চিকিৎসা আমি করলেও শহরের বড় বড় ডাক্তার সকলেই দেখেছেন। ত্রিদিববাবু—'

পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'রোগটা কি হয়েছিল?'

ডাক্তার পালিত বিলাতি নিদানশাস্ত্র সম্মত রোগের যে সকল লক্ষণ বলিলেন তাহা হইতে অনুমান করিলাম, নানা জাতীয় দুষ্ট বীজাণু লিভারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রক্তাল্পতা ঘটাইয়াছিল এবং হৃদ্‌পিণ্ডকে জখম করিবার তালে ছিল, ইন্‌জেকশন প্রভৃতি আসুরিক চিকিৎসার দ্বারা তাহাদের বশে আনিতে হইয়াছে। এখন অবশ্য রোগীর অবস্থা খুবই ভাল, তবু তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে।

এই সময় পিছন দিকে নাক ঝাড়ার মত একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, একটি যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং নাকের মধ্যে শব্দ করিয়া বোধকরি উপেক্ষা জ্ঞাপন করিতেছে। যুবকের চেহারা কৃকলাসের মত, অঙ্গে ফ্যাশন-দুরস্ত বিলাতি সাজপোশাক, মুখে ব্যঙ্গ দম্ভ। দীপনারায়ণ পরিচয় করাইয়া দিলেন—'ইনি ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদ, একজন নবীন

বিহারী ডাক্তার।' ডাক্তার অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে ঘাড় নাড়িলেন এবং যে কয়টি কথা বলিলেন তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, প্রবীণ ডাক্তারদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধার অন্ত নাই, বিশেষত যদি তাঁহারা বাঙালী ডাক্তার হন। দীপনারায়ণ সিং-এর চিকিৎসার ভার কয়েকজন বুড়া বাঙালী ডাক্তারকে না দিয়া তাঁহার হাতে অর্পণ করিলে তিনি পাঁচ দিনে রোগ আরাম করিয়া দিতেন। তাঁহার কথা শুনিয়া দীপনারায়ণ সিং মুখ বাঁকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ডাক্তার পালিত বিরক্ত হইয়া আবার পূর্বস্থানে গিয়া বসিলেন। ডাক্তার জগন্নাথ আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়া, অদূরে পানীয়বাহী একজন ভৃত্যকে দেখিয়া হ্রেষাধ্বনি করিতে করিতে সেইদিকে ধাবিত হইলেন।

দীপনারায়ণ সিং লজ্জা ও ক্ষোভ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, 'এরাই হচ্ছে নতুন যুগের বিহারী। এদের কাছে গুণের আদর নেই, সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলে এরা শুধু নিজের সুবিধা করে নিতে চায়। আজ বিহারে বাঙালীর কদর কমে যাচ্ছে, এরাই তার জন্যে দায়ী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়তো বাঙালীরও দোষ আছে।'

দীপনারায়ণ বলিলেন, 'হয়তো আছে। কিন্তু পরিহাস এই যে, এরা যখন রোগে পড়ে, যখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়, তখন এরাই ছুটে যায় বাঙালী ডাক্তারের কাছে।'

এই অপ্রীতিকর প্রাদেশিক প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় আমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িতেছিলাম, কিন্তু পাণ্ডেজি তাহা সরল করিয়া দিলেন, দুই চারিটা অন্য কথা বলিয়া আমাদের লইয়া গিয়া যেখানে ডাক্তার পালিত বসিয়া ছিলেন সেইখানে বসাইলেন।

আমরা উপবিষ্ট হইলে ডাক্তার পালিত একটু অম্ল হাসিয়া বলিলেন, 'ঘোড়া জগন্নাথ আর কি কি বললে ?'

পাণ্ডেজি হাসিয়া উঠিলেন, 'ওর নাম বুঝি ঘোড়া জগন্নাথ ? খাসা নাম, ভারি লাগ-সৈ হয়েছে। কিন্তু ওদের কথায় আপনি কান দেবেন না ডাক্তার। ওদের কথা কে গ্রাহ্য করে ?'

পালিত বলিলেন, 'কান না দিয়ে উপায় কি ? ওরা যে দল বেঁধে প্রচার কার্য করে বেড়াচ্ছে। যারা বুদ্ধিমান তারা হয়তো গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সাধারণ লোকে ওদের কথাই শোনে।'

আমাদের আলোচনা হয়তো আর কিছুক্ষণ চলিত কিন্তু হঠাৎ পাশের দিকে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসির শব্দে তাহাতে বাধা পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, অদূরে অন্য একটি সোফা-সেটে তিনটি লোক আসিয়া বসিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিতেছে তাহার দেহায়তন এতই বিপুল যে সে একাই সমস্ত সোফাটি জুড়িয়া বসিয়াছে। ব্যূঢ়োরস্ক গজস্কন্ধ যুবক, চিবুক হইতে নিতম্ব পর্যন্ত থরে থরে চর্বির তরঙ্গ নামিয়াছে। তাহার কণ্ঠ হইতে যে বিচিত্র হাস্যধ্বনি নির্গত হইতেছে তাহা যে একই কালে একই মানুষের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা কঠিন। একসঙ্গে যদি গোটা দশেক শৃগাল হুকাহুয়া করিয়া ডাকিয়া ওঠে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা পেঁচোয় পাওয়া আঁতুড়ে ছেলে কান্না জুড়িয়া দেয় তাহা হইলে বোধহয় এই শব্দ-সংগ্রামের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

অন্য লোক দুটি নীরবে বসিয়া মুচকি হাসিতেছিল। আশ্চর্য এই যে মোটা যুবকটি যে-পরিমাণে মোটা, তাহার সঙ্গী দুটি ঠিক সেই পরিমাণে রোগা। ইহাদের তিনজনের দেহের মেদ মাংস সমানভাবে বাঁটিয়া দিলে বোধকরি তিনটি হৃষ্টপুষ্ট সাধারণ মানুষ পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য হাসির এই অট্টরোলে ঘরসুদ্ধ লোকের সচকিত দৃষ্টি সেইদিকে ফিরিয়াছিল। একটি রেশমী পাগড়ি-পরা কৃশকায় বৃদ্ধ কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়া দ্রুত সেইদিকে অগ্রসর

হইলেন।

ব্যোমকেশ ডাক্তার পালিতকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'গজকচ্ছপটি কে?'

ডাক্তার পালিত মুখ টিপিয়া বলিলেন, 'দীপনারায়ণবাবুর ভাইপো দেবনারায়ণ। একটি আস্ত—' কথাটা ডাক্তার শেষ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার অনুচ্চারিত বিশেষ্যটি স্পষ্টই বোঝা গেল। ইহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কাল পাণ্ডেজি বলিয়াছিলেন—ঘোর অপদার্থ। শুধু অপদার্থই নয়, বুদ্ধিসুদ্ধিও শরীরের অনুরূপ। পাগড়ি-পরা বৃদ্ধটি আসিয়া রোগা যুবক দুটিকে কানে কানে কিছু বলিলেন, মনে হইল তিনি তাহাদের মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন। রোগা লোক দুটিও যেন অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছে এইভাবে ভিজা বিড়ালের মত চক্ষু নত করিয়া রহিল। গজকচ্ছপের হাসি তখনও থামে নাই, তবে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং কানের কাছে নত হইয়া কিছু বলিলেন। হঠাৎ ব্রেককষা গাড়ির মত গজকচ্ছপের হাসি হেঁচকা দিয়া থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ পূর্ববৎ ডাক্তার পালিতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রোগা লোক দুটি কে?'

পালিত বলিলেন, 'ওই যেটির কোঁকড়া চুল কাঁকড়া গোঁফ ও হচ্ছে দেবনারায়ণের বিদূষক, মানে ইয়ার। নাম বেণীপ্রসাদ। অন্যটির নাম লীলাধর বংশী—দীপনারায়ণবাবুর স্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং দেবনারায়ণের অ্যাসিস্ট্যান্ট বিদূষক।'

'আর বৃদ্ধটি?'

'বৃদ্ধটি লীলাধরের বাবা গঙ্গাধর বংশী, স্টেটের বড় কর্তা, অর্থাৎ ম্যানেজার। গভীর জলের মাছ।'

গভীর জলের মাছটি একবার চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন এবং মন্দমধুর হাস্যে আমাদের অভিসিঞ্চিত করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। দেবনারায়ণ নিজ ঝকমকে শার্কস্কিনের গলাবন্ধ কোটের পকেট হইতে একটি সুবৃহৎ পানের ডিবা বাহির করিয়া কয়েকটা পান গালে পুরিয়া গুরু গম্ভীর মুখে চিবাইতে লাগিল। এই লোকটাই কিছুক্ষণ পূর্বে হট্টগোল করিয়া হাসিতেছিল তাহা আর বোঝা যায় না।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসির কারণটা কী কিছু বুঝতে পারলেন?'

পালিত বলিলেন, 'বোধহয় বিদূষকেরা রসের কথা কিছু বলেছিল তাই এত হাসি।'

একজন ভৃত্য রূপার থালায় সোনালী তবক মোড়া পান ও সিগারেট লইয়া উপস্থিত হইল। আমরা সিগারেট ধরাইলাম। ব্যোমকেশ এদিকে ওদিকে চাহিয়া পাণ্ডেজিকে বলিল, 'ইন্সপেক্টর রতিকান্তকে দেখছি না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'হয়তো অন্য ঘরে আছে। কিম্বা হয়তো থানায় আটকে গেছে। আসবে নিশ্চয়। আপনারা বসুন, আমি একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।'

পাণ্ডেজি উঠিয়া গেলেন। আমরা তিনজনে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে ঘরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অতিথিগুলিকে দর্শন করিতে লাগিলাম। অতিথিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি, দু' একটি স্ত্রীলোক আছেন।

এই সময় ঘরের অন্য প্রান্তের একটি দ্বার দিয়া এক মহিলা প্রবেশ করিলেন। ঘরে বেশ উজ্জ্বল আলো ছিল, এখন মনে হইল কেবলমাত্র এই মহিলাটির আবির্ভাবে ঘরটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তিনি কোন্ রঙের শাড়ি পরিয়াছেন, কী কী গহনা পরিয়াছেন কিছুই চোখে পড়িল না, কেবল দেখিলাম, আলোকের একটি সঞ্চরমাণ উৎস ধীরে ধীরে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন, কেহ

কেহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন। মহিলাটি হাসিমুখে লীলায়িত ভঙ্গিমায় সকলকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে আমাদের দিকেই আসিতে লাগিলেন।

ডাক্তার পালিত অ্যাশ-ট্রের উপর সিগারেট ঘসিয়া নিভাইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, 'মিসেস দীপনারায়ণ—শকুন্তলা।'

রূপসী বটে। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের কম হইবে না, কিন্তু সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবনের মদোদ্ধত লাবণ্য যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ লাবণ্যবতী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা রমণী হয়তো দুই চারিটি দেখা যায়, কিন্তু এদিকে বেশি দেখা যায় না। শকুন্তলা নামটিও যেন রূপের সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করিয়াছে। শকুন্তলা—অপ্সরাকন্যা শকুন্তলা—যাহাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত ভুলিয়াছিলেন। দীপনারায়ণ সিং প্রৌঢ় বয়সে কেন অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না।

শকুন্তলা আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমরা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলাম। ডাক্তার পালিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। শকুন্তলা অতি মিষ্ট স্বরে দুই চারিটি সাদর সম্ভাষণের কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার গৃহিণীসুলভ সৌজন্য এবং তরুণীসুলভ শালীনতা দুইই প্রকাশ পাইল। তারপর তিনি অন্যদিকে ফিরিলেন।

এই সময় লক্ষ্য করিলাম শকুন্তলা একা নয়, তাঁহার পিছনে আর একটি যুবতী রহিয়াছেন। সূর্যের প্রভায় যেমন শুকতারা ঢাকা পড়িয়া যায়, এতক্ষণ এই যুবতী তেমনি ঢাকা পড়িয়া ছিলেন ; এখন দেখিলাম তাঁহার কোলে একটি বছর দেড়েকের ছেলে। বস্তুত এই ছেলেটি হঠাৎ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াই যুবতীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। যুবতী শকুন্তলার চেয়ে বোধহয় দু' এক বছরের ছোটই হইবেন ; সুশ্রী গৌরাঙ্গী, মোটাসোটা ঢিলাঢালা গড়ন, মহার্ঘ বস্ত্র ও গহনার ভারে যেন নড়িতে পারিতেছেন না। তাঁহার বেশবাসের মধ্যে প্রাচুর্য আছে কিন্তু নিপুণতা নাই। তাছাড়া মনে হয় প্রকাশ্যভাবে পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতে তিনি অভ্যস্ত নন, পর্দার ঘোর এখনও কাটে নাই।

শিশু কাঁদিয়া উঠিতেই শকুন্তলা পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। তাঁহার মুখে একটু অপ্রসন্নতার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন, 'চাঁদনী, খোকাকে এখানে এনেছ কেন ? যাও, ওকে নার্সের কাছে রেখে এস।'

প্রভুভক্ত কুকুর প্রভুর ধমক খাইয়া যেভাবে তাকায়, যুবতীও সেইভাবে শকুন্তলার মুখের পানে চাহিলেন, তারপর নম্রভাবে ঘাড় হেলাইয়া শিশুকে লইয়া যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন।

দীপনারায়ণ দূর হইতে স্ত্রীকে আহ্বান করিলেন—'শকুন্তলা !' কয়েকজন হোমরাচোমরা অতিথি আসিয়াছেন।

শকুন্তলা সেই দিকে গেলেন। পাশের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া দেখিলাম, দেবনারায়ণ কোলা ব্যাঙের মত ড্যাবডেবে চোখ মেলিয়া শকুন্তলার পানে চাহিয়া আছে।

আমরা আবার সিগারেট ধরাইলাম। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'দ্বিতীয় মহিলাটি কে ?'

ডাক্তার পালিত অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, 'দেবনারায়ণের স্ত্রী। ছেলেটিও দেবনারায়ণের।'

লক্ষ্য করিলাম ডাক্তার পালিতের কপালে একটু ভ্রূকুটির চিহ্ন। তাঁহার চক্ষুও শকুন্তলাকে অনুসরণ করিতেছে।

তারপর আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সময় কাটাইলাম। ডাক্তার পালিত অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন এবং তাঁহার চক্ষু দুটি ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে শকুন্তলাকে অনুসরণ

করিতে লাগিল।

সাড়ে আটটার সময় আহারের আহ্বান আসিল।

অন্য একটি হল-ঘরে টেবিল পাতিয়া আহারের ব্যবস্থা। রাজকীয় আয়োজন। কলিকাতার কোন বিলাতি হোটেল হইতে পাচক ও পরিবেশক আসিয়াছে। আহার শেষ করিয়া উঠিতে পৌনে দশটা বাজিল।

বাহিরের হল-ঘরে আসিয়া পান সিগারেট সেবনে যত্নবান হইলাম। ডাক্তার পালিত একটি পরিতৃপ্ত উদ্গার তুলিয়া বলিলেন, 'মন্দ হল না।—আচ্ছা, আজ চলি, রাত্তিরে বোধহয় একবার রুগী দেখতে বেরুতে হবে। আবার কাল সকালেই দীপনারায়ণবাবুকে ইন্‌জেকশন দিতে আসব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখনও ইন্‌জেকশন চলছে নাকি?'

পালিত বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখনও হপ্তায় একটা করে লিভার দিচ্ছি। আর গোটা দুই দিয়ে বন্ধ করে দেব। আচ্ছা—নমস্কার। আপনারা তো এখনও আছেন, দেখা হবে নিশ্চয়—'

তিনি প্রস্থানের জন্য পা বাড়াইয়াছেন এমন সময় দেখিলাম সদর দরজা দিয়া ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরী প্রবেশ করিতেছে। তাহার পরিধানে পুলিসের বেশ, কেবল মাথায় টুপি নাই। একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব। দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সে একবার ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, তারপর ডাক্তার পালিতকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'ডাক্তার পালিত, একটা খারাপ খবর আছে। আপনার ডিস্‌পেনসারিতে চুরি হয়েছে।'

'চুরি!'

রতিকান্ত বলিল, 'হ্যাঁ। আন্দাজ ন'টার সময় আমি থানা থেকে বেরিয়ে এখানে আসছিলাম, পথে নজর পড়ল ডিস্‌পেনসারির দরজা খোলা রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি দরজার তালা ভাঙা। ভেতরে গিয়ে দেখলাম আপনার টেবিলের দেরাজ খোলা, চোর দেরাজ ভেঙে টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আমি একজন কনস্টেবলকে বসিয়ে এসেছি। আপনি যান। দেরাজে কি টাকা ছিল?'

পালিত হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, 'টাকা! রাত্রে বেশি টাকা তো থাকে না, বড় জোর দু'চার টাকা ছিল।'

'তবু আপনি যান। টাকা ছাড়া যদি আর কিছু চুরি গিয়ে থাকে আপনি বুঝতে পারবেন।'

'আমি এখনি যাচ্ছি।'

'আর, টাকা ছাড়া যদি অন্য কিছু চুরি গিয়ে থাকে আজ রাত্রেই থানায় এত্তালা পাঠিয়ে দেবেন।'

শকুন্তলা ও পাণ্ডেজি দূরে দাঁড়াইয়া বাক্যালাপ করিতেছিলেন, আমাদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'কি হয়েছে?'

ডাক্তার পালিত দাঁড়াইলেন না, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। রতিকান্ত চুরির কথা বলিল। তারপর শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আমার বড় দেরি হয়ে গেল—খেতে পাবো তো?'

শকুন্তলা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'পাবেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

গৃহস্বামী পূর্বেই বিশ্রামের জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন, আমরা শকুন্তলার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

পরদিন সকাল আন্দাজ ন'টার সময় একখানা মোটর আসিয়া আমাদের বাসার সম্মুখে থামিল। ব্যোমকেশ খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, 'পাণ্ডেজি—এত সকালে!'

পরক্ষণেই পাণ্ডেজি আমাদের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরিধানে পুলিস ইউনিফর্ম, মুখ গম্ভীর। ব্যোমকেশের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলিলেন, 'দীপনারায়ণ সিং মারা গেছেন।'

আমরা ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম, কথাটা ঠিক যেন হৃদয়ঙ্গম হইল না।

'মারা গেছেন!'

'এইমাত্র রতিকান্ত টেলিফোন করেছিল। সকালবেলা ডাক্তার পালিত এসেছিলেন দীপনারায়ণ সিংকে ইন্‌জেকশন দিতে। ইন্‌জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। আমি সেখানেই যাচ্ছি। আপনারা যাবেন?'

ব্যোমকেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া আলোয়ানাখানা কাঁধে ফেলিল। আমিও উঠিলাম।

'চলুন।'

মোটরে যাইতে যাইতে কাল রাত্রির দৃশ্যগুলি মনে পড়িতে লাগিল। দীপনারায়ণ সিংকে একবারই দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে ভাল লাগিয়াছিল; শিষ্ট সহাস্য ভদ্রলোক, রোগ হইতে সারিয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ কী হইল? আর শকুন্তলা—

শকুন্তলা বিধবা হইয়াছেন...অন্তর হইতে যেন এই নিষ্ঠুর সত্য স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। ফটকের কাছে গোটা তিনেক মোটর দাঁড়াইয়া আছে। পাণ্ডেজি গাড়ি থামাইয়া অবতরণ করিলেন। দেউড়ি পার হইয়া আমরা বাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। বাগানে কেহ নাই, চারিদিক যেন থমথম করিতেছে।

সদর দরজার সম্মুখে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত গম্ভীর মুখে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিল। আমাদের দেখিয়া তাহার ভ্রূ ঈষৎ উত্থিত হইল, কিন্তু সে কিছু না বলিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

হল-ঘরের দ্বারের সম্মুখে পালঙ্কের মত আসনটি পূর্ববৎ রহিয়াছে, তাহার উপর দীপনারায়ণ সিং-এর মৃতদেহ। মৃতদেহের পাশে বসিয়া ডাক্তার পালিত এক দৃষ্টে মৃতের মুখের পানে চাহিয়া আছেন। ঘরে আর কেহ নাই, কেবল আসবাবগুলি গত রাত্রির মতই সাজানো রহিয়াছে।

আমরা পা টিপিয়া টিপিয়া পালঙ্কের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দীপনারায়ণ সিংকে কাল রাত্রে যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ মৃত্যুর স্পর্শে তাঁহার আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। চক্ষু মুদিত, মুখের স্নায়ু পেশী শিথিল; যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ডাক্তার পালিত এমন তন্ময় হইয়া মৃতের মুখের পানে চাহিয়া ছিলেন যে আমাদের আগমন বোধহয় জানিতে পারেন নাই। পাণ্ডেজির লঘু করস্পর্শে তাঁহার চমক ভাঙিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া একে একে আমাদের মুখের পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন, 'পোস্ট-মর্টেম হওয়া দরকার। আর—এই শিশিটা রাখুন।' তাঁহার হাতের কাছে একটি রবারের স্টপার দেওয়া ক্ষুদ্র বাদামী রঙের শিশি ছিল, সেটি পাণ্ডেজিকে দিলেন। পাণ্ডেজি শিশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন তখনও তাহাতে প্রায় আধ শিশি তরল পদার্থ রহিয়াছে। তিনি শিশিটি রতিকান্তের হাতে দিয়া শান্তকণ্ঠে ডাক্তারকে বলিলেন, 'আসুন, ওদিকে গিয়ে বসা

যাক।’

ডাক্তার পালিত তাঁহার হ্যান্ডব্যাগটি পালঙ্কের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন। আমরা সকলে অদূরে একটি সোফা-সেটে গিয়া বসিলাম। রতিকান্ত দাঁড়াইয়া রহিল। পাণ্ডেজি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বাড়ির আর সকলে কোথায় ?’

রতিকান্ত বলিল, ‘তাদের সব ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। মিস্ মান্না শকুন্তলা দেবীর কাছে আছেন।’

‘মিস্ মান্না কে ? লেডি ডাক্তার ?’

পালিত বলিলেন, ‘হ্যাঁ। তিনিও এ বাড়ির বাঁধা ডাক্তার। শকুন্তলার অবস্থা দেখে তাঁকে টেলিফোন করে আনিয়ে নিয়েছি।’

‘বেশ করেছেন। দেবনারায়ণের খবর কি ?’

‘দেবনারায়ণটা ইডিয়ট—ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কাঁদছে। দেওয়ান গঙ্গাধর বংশী তার কাছে আছে। বেচারী চাঁদনীরই বিপদ, নিজে কাঁদছে, একবার স্বামীর কাছে ছুটে আসছে, একবার শকুন্তলার কাছে ছুটে যাচ্ছে।’ তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাণ্ডেজি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, ‘ডাক্তার পালিত, এবার গোড়া থেকে সব কথা বলুন।’

ডাক্তার তাঁহার ব্যাগটি কোলের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, ‘বলবার বেশি কিছু নেই। আন্দাজ আটটার সময় আমি এসে দেখলাম দীপনারায়ণবাবু ওই পালঙ্কে বসে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন—এই শীতে আপনি এত শীগ্‌গির আসবেন ভাবিনি, চা খান। আমি বললাম—আচ্ছা, আগে ইন্‌জেকশনটা দিই। চাঁদনী উপস্থিত ছিলেন, শকুন্তলা আজ উপস্থিত ছিলেন না। আমি দীপনারায়ণবাবুর নাড়ি দেখলাম, নাড়ি বেশ ভাল। তখন সিরিঞ্জে লিভার এক্সট্র্যাক্ট ভরে তাঁর বাহুতে ইন্‌জেকশন দিলাম। ইন্‌ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকশন, হাঙ্গামা কিছু নেই, কিন্তু দীপনারায়ণবাবু আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লেন। দেখলাম তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে বুজে আসছে ; তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু বলতে পারলেন না। আমি তখনই তাঁকে এড্রেনালিন্ দিলাম, তারপর আর্টিফিসিয়াল রেস্‌পিরেশন দিতে লাগলাম। কিন্তু কোনও ফল হল না, তিন-চার মিনিটের মধ্যে তাঁর ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল।’

ডাক্তার একবার নিজের বুকের উপর আঙুল বুলাইয়া নীরব রহিলেন। তিনি প্রবীণ ডাক্তার, আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার কাছে নূতন নয়। কিন্তু তিনি যে ভিতরে ভিতরে কত বড় ধাক্কা খাইয়াছেন তাহা তাঁহার কঠিন সংযম ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

পাণ্ডেজি বলিলেন, ‘মৃত্যুর কারণ কী তা আপনি বুঝতে পারেননি ?’

ডাক্তার বলিলেন, ‘লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল—এনাফিলেকটিক শক্। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।’

‘তবে কী হতে পারে ?’

‘ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো কোনও বিষ।’

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, ব্যোমকেশ বলিল, ‘কিউরারি বিষ হতে পারে কি ?’

ডাক্তার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর কতকটা নিজ মনেই বলিলেন, ‘কিউরারি ! হতে পারে। তবে পোস্ট-মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় বলা যায় না।’

‘যদি কিউরারি বিষে মৃত্যু হয়ে থাকে পোস্ট-মর্টেমে কিউরারি পাওয়া যাবে ?’

'যাবে। কিডনীতে পাওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি যে শিশিটা এখনি পাণ্ডেজিকে দিলেন ওটা কি?'

ডাক্তার বলিলেন, 'ওটা লিভার এক্সট্র্যাক্টের ভায়াল। ওতে দশ শিশি ওষুধ থাকে, ভায়ালের মুখ রবার দিয়ে সীল করা থাকে। সিরিঞ্জের ছুঁচ রবারে ঢুকিয়ে ভায়াল থেকে দরকার মতো ওষুধ বের করে নেওয়া যায়। আজ আমি ওই ভায়াল থেকেই ওষুধ বের করে ইন্‌জেকশন দিয়েছিলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্‌জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে যখন মৃত্যু হয়েছে তখন অনুমান করা যেতে পারে যে ইন্‌জেকশনই মৃত্যুর কারণ। তাহলে ওই ভায়ালে বিষ আছে?'

ডাক্তার বলিলেন, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ—কাল সন্ধ্যেবেলা ওই ভায়াল থেকেই একজন রুগীকে ইন্‌জেকশন দিয়েছি, সে দিব্যি বেঁচে আছে।'

'ভায়ালটা আপনার ব্যাগের মধ্যেই থাকে?'

'হ্যাঁ। ফুরিয়ে গেলে একটা নতুন ভায়াল রাখি।'

'আচ্ছা, বলুন দেখি, কাল রাত্তিরে আপনার ব্যাগ কোথায় ছিল?'

'ডিস্‌পেনসারিতে ছিল।'

'রাত্তিরে যখন কল আসে তখন কি করেন, ডিস্‌পেনসারি থেকে ব্যাগ নিয়ে রুগী দেখতে যান?'

'না, আমার বাড়িতে আর একটা ব্যাগ থাকে, রাত্তিরে কল এলে সেটা নিয়ে বেরুই।'

'বুঝেছি। কাল রাত্তিরে যখন আপনার ডিস্‌পেনসারিতে চোর ঢুকেছিল তখন এ ব্যাগটা সেখানেই ছিল?'

'হ্যাঁ।' ডাক্তার চকিত হইয়া উঠিলেন—'কাল রাত্রি আন্দাজ সাতটার সময় আমি রুগী দেখে ডিস্‌পেনসারিতে ফিরে আসি। তখন আর বাড়ি ফেরবার সময় ছিল না, ব্যাগ রেখে কম্পাউণ্ডারকে বন্ধ করতে বলে সটান এখানে চলে এসেছিলাম।'

'ও'—ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিল, 'কম্পাউণ্ডার কখন ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করে চলে গিয়েছিল আপনি জানেন?'

'জানি বৈকি। কাল রাত্রে চুরির খবর পেয়ে এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি কম্পাউণ্ডারকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, সাতটার পরই সে ডাক্তারখানা বন্ধ করে নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল।'

'ভাল কথা, ডিস্‌পেনসারি থেকে আর কিছু চুরি গিয়েছিল কিনা জানতে পেরেছেন?'

'আর কিছু চুরি যায়নি। শুধু টেবিলের দেরাজ থেকে কয়েকটা টাকা আর সিকি আধুলি গিয়েছিল।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির দিক হইতে রতিকান্তের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'তাহলে চুরির আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল।'

রতিকান্ত এতক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ব্যোমকেশের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল। যে প্রশ্ন পুলিসের করা উচিত তাহা একজন বাহিরের লোক করিতেছে ইহা বোধহয় তাহার ভাল লাগে নাই। কিন্তু ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির বন্ধু, তাই সে নীরব ছিল। এখন সে একটু নীরস স্বরে বলিল, 'কী বোঝা গেল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলেন না? চোর টাকা চুরি করতে আসেনি। সে লিভার এক্সট্র্যাক্টের ভায়ালটা বদলে দিয়ে গেছে।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বদলে দিয়ে গেছে?'

'কিম্বা ডাক্তারবাবুর ভায়ালে কয়েক ফোঁটা তরল কিউরারি সিরিঞ্জের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। ফল একই। চোর জানত আজ সকালবেলা দীপনারায়ণ সিংকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে।—এবার ব্যাপারটা বুঝেছেন?'

কিছুক্ষণ সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তারপর পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আজ সকালে ইন্‌জেকশন দেওয়া হবে কে কে জানত?'

ডাক্তার বলিলেন, 'বাড়ির সকলেই জানত রবিবার সকালে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়, আমি প্রথমে ওঁকে ইন্‌জেকশন দিয়ে তারপর রুগী দেখতে বেরুই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল রাত্তিরে আমিও জানতে পেরেছিলাম, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন। সুতরাং ওদিক থেকে কাউকে ধরা যাবে না।'

ইন্সপেক্টর রতিকান্ত কথা বলিল, পিছন হইতে পাণ্ডেজির চেয়ারের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, 'স্যার, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো অপঘাত মৃত্যু, ডাক্তার পালিত ভুল করে অন্য ওষুধ ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—। আমি এ কেসের চার্জ নিতে চাই।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নিশ্চয়, তোমারই তো এলাকা। তুমি চার্জ নাও। এখনি লাশ পোস্ট-মর্টেমের জন্য পাঠাও। আর ওই ওষুধের ভায়ালটা পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দাও। এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়া চাই।'

রতিকান্তের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, নিষ্পত্তি আমি করব। দীপনারায়ণবাবু আমার মুরুব্বি ছিলেন, কুটুম্ব ছিলেন, তাঁকে যে খুন করেছে সে আমার হাতে ছাড়া পাবে না।'

তাহার কথাগুলা একটু নাটুকে ধরনের হইলেও ভিতরে খাঁটি হৃদয়াবেগ ছিল। সে স্যালুট করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পাণ্ডেজি বলিলেন, 'রতিকান্ত, আমার বন্ধু শ্রীব্যোমকেশ বক্সীকে তুমি বোধহয় চেনো না। উনি বিখ্যাত ব্যক্তি, আমাদের লাইনের লোক। উনিও তোমাকে সাহায্য করবেন।'

রতিকান্ত ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে খানিকটা বিস্ময়ের ভাব ছিল, এখন সত্য পরিচয় পাইয়া সে সুখী হইতে পারে নাই তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি বিখ্যাত ব্যোমকেশ বক্সী? আপনার কয়েকটি কাহিনী আমি পড়েছি, হিন্দীতে অনুবাদ হয়েছে। তা আপনি যদি অনুসন্ধানের ভার নেন—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, তদন্ত আপনি করবেন। আমার পরামর্শ যদি দরকার হয় আমি সাধ্যমত সাহায্য করব—এর বেশি কিছু নয়।'

রতিকান্ত বলিল, 'ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।—আচ্ছা স্যার, আমি এবার যাই, লাশের ব্যবস্থা করতে হবে।' স্যালুট করিয়া রতিকান্ত চলিয়া গেল।

আমরাও উঠিলাম। এখানে বসিয়া থাকিয়া আর লাভ নাই। ডাক্তার পালিত ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'আমি শকুন্তলাকে একবার দেখে যাই। অবশ্য, তার কাছে মিস্ মান্না আছেন—'

এই সময় বাড়ির ভিতর দিক হইতে একটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘাঙ্গী, আঁট-সাঁট শাড়ি পরা, চোখে চশমা, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, ভাবভঙ্গীতে চরিত্রের দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাঁহাকে দেখিয়া ডাক্তার পালিত সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দুইজনে নিম্ন স্বরে কথা হইতে লাগিল।

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির পানে চাহিয়া ভ্রূ তুলিল, পাণ্ডেজি হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন, 'মিস্ মান্না।'

মিস্ মান্না কিছুক্ষণ কথা বলিয়া আবার ভিতর দিকে চলিয়া গেলেন, ডাক্তার পালিত

আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম তাঁহার কপালে গভীর ভ্রূকুটি।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নতুন খবর কিছু আছে নাকি ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'খবর আছে, কিন্তু নতুন নয়। কাল রাত্রেই সন্দেহ করেছিলাম।'

'কি সন্দেহ করেছিলেন ?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন, 'শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা।'

চার

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ফটকের দিকে যাইতে যাইতে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। ডাক্তার পালিতের উদ্বিগ্ন অনুসন্ধিৎসু চক্ষু শকুন্তলাকে অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি অভিজ্ঞ ডাক্তার, অন্যের কাছে যাহা লক্ষণীয় নয়, তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখে উদ্বেগ ও সংশয়ের ছায়া দেখিলাম কেন ? কিসের উদ্বেগ ?

ফটকের বাহিরে আসিয়া ডাক্তার নিজের মোটরে উঠিবার উপক্রম করিলেন, তারপর কি ভাবিয়া আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডেজিকে বলিলেন, 'আমার হাতেই দীপনারায়ণবাবুর মৃত্যু হয়েছে। আমাকে যদি আপনারা অ্যারেস্ট করতে চান আমার কিছু বলবার নেই। এখন আমি রুগী দেখতে চললাম। যখনই তলব করবেন থানায় হাজির হব।'

পাণ্ডেজি কিছু বলিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন। ডাক্তার নড করিয়া মোটরে উঠিলেন এবং মোটর হাঁকাইয়া প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডেজি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'এখনও সাড়ে দশটা বাজেনি। চলুন আমার বাসায়।'

আমরা মোটরে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় আর একটি মোটর আসিয়া থামিল। পুরানো হাড়-নড়বড়ে মরিস গাড়ি, তাহা হইতে অবতরণ করিল নবীন ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদ। আমাদের দেখিয়া সে নাক-ঝাড়ার শব্দ করিল, তারপর পাণ্ডেজির দিকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া বলিল, 'সকালবেলা আপনি এখানে ?'

জগন্নাথকে দেখিয়া পাণ্ডেজির মুখ গম্ভীর হইয়াছিল, তিনি পালটা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি এখানে ?'

জগন্নাথ হাল্কা সুরে বলিল, 'এদিক দিয়ে রুগী দেখতে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দীপনারায়ণজিকে দেখে যাই। কেমন আছেন তিনি ?'

পাণ্ডেজি হিম-কঠিন কণ্ঠে বলিলেন, 'কেমন আছেন তিনি তা আপনি ভালভাবেই জানেন। ন্যাকামি করবার দরকার কি ?'

ক্ষণেকের জন্য জগন্নাথ ডাক্তার থতমত খাইয়া গেল, তারপর অসভ্যের মত দাঁত বাহির করিয়া বলিল, 'তাহলে যা শুনেছি তা সত্যি—পান্নালাল পালিত দীপবাবুকে ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরেছে।'

পাণ্ডেজি অতি কষ্টে ধৈর্য রক্ষা করিয়া ধীর স্বরে কহিলেন, 'দীপনারায়ণবাবু মারা গেছেন। কী করে মারা গেছেন তা আপনার জানবার দরকার নেই, আপনি এ বাড়ির ডাক্তার নন। এ বাড়ি এখন পুলিসের দখলে, আপনি ইন্সপেক্টর রতিকান্ত চৌধুরীর অনুমতি না নিয়ে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।'

জগন্নাথ একবার আমাদের দিকে ধৃষ্ট নেত্রপাত করিল, বলিল, 'আপনিও দেখছি বাঙালীদের

দলে ভিড়েছেন। তা ভিড়ুন, কিন্তু অসুখে পড়লে বাঙালী ডাক্তারের কাছে যাবেন না। দীপুবাবুর দৃষ্টান্তটা মনে রাখবেন।'

পাণ্ডেজি উত্তর দিবার আগেই জগন্নাথ নিজের মোটরে গিয়া উঠিল এবং ঝড়্‌ঝড়্ শব্দ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

পাণ্ডেজিকে আগে কখনও রাগিতে দেখি নাই, এখন দেখিলাম তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ রাগে রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি গলার মধ্যে একটা অবরুদ্ধ শব্দ করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। আমরাও উঠিলাম।

মিনিট দশেকের মধ্যে পাণ্ডেজির বাসায় পৌঁছানো গেল। পাণ্ডেজি চায়ের হুকুম দিলেন, কারণ পশ্চিমের শীতে চা-পানের কোনও নির্ধারিত সময় নাই। তারপর আমরা বসিবার ঘরে গিয়া অধিষ্ঠিত হইলাম। পাণ্ডেজি প্রশ্ন করিলেন, 'কী মনে হল ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই বটে, আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। যিনি এই কার্যটি করেছেন তিনি অতি কৌশলী ব্যক্তি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দীপনারায়ণ সিংকে খুন করে কার লাভ ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'লাভ একমাত্র দেবনারায়ণের। দীপনারায়ণ অপুত্রক মারা গেছেন, সুতরাং সব সম্পত্তিই এখন তার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অপুত্রক কিনা এখনও ঠিক বলা যায় না, শকুন্তলা দেবীর ছেলে হতে পারে। কিন্তু দেবনারায়ণ হয়তো খবরটা জানত না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না জানাই সম্ভব। মৃত্যুর পূর্বে কেবল দীপনারায়ণ সিং বোধহয় খবরটা জানতে পেরেছিলেন।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তিনি জানতে পারলে কি চুপ করে থাকতেন ? যাহোক, ধরা যাক তিনি জানতেন না, শকুন্তলা স্বামীকে বলেননি। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে কী ? দেবনারায়ণ সমস্ত সম্পত্তির লোভে খুড়োকে খুন করিয়েছে। নিজের হাতে এ কাজ করেনি, করবার মত বুদ্ধি তার নেই।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কাল রাত্রি সওয়া সাতটার সময় আমরা যখন দীপনারায়ণের বাড়িতে গিয়েছি তখন দেবনারায়ণ বাড়িতেই ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অত বড় হাতির শরীর নিয়ে সে নিজে ডাক্তারখানায় যায়নি নিশ্চয়। কিন্তু অন্য কেউ যেতে পারে, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তার মোসাহেবরা—'

চা আসিল। ব্যোমকেশ পেয়ালায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া সিগারেট ধরাইল, কতকটা মানসিক জল্পনার সুরে বলিল, 'কিন্তু দেবনারায়ণ যদি খুড়োর গঙ্গাযাত্রা না করিয়ে থাকে, তাহলে আর কে করতে পারে ? কার লাভ ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আর কারুর লাভ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে ওই ব্যাটা ঘোড়া জগন্নাথের অসাধ্য কাজ নেই। বাঙালী ডাক্তারদের অপদস্থ করবার জন্যে ওরা সব পারে।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'ঘোড়া জগন্নাথের ওপর আপনি ভীষণ চটে গেছেন। ওরা সব ছুঁচো-প্যাঁচা, খুন করার সাহস ওদের নেই। যে খুন করেছে তার চরিত্র অন্য রকম ; সে মহা দুঃসাহসী অথচ কূটবুদ্ধি, শিক্ষিত অথচ নৃশংস ; বিজ্ঞান জানে, ডাক্তারি বিদ্যেও আছে—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'ঘোড়া জগন্নাথের সঙ্গে আপনার বর্ণনা খাসা মিলে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঘোড়া জগন্নাথের মোটিভ খুব জোরালো নয়। অবশ্য তার যদি অন্য কোনও মোটিভ থাকে তাহলে আলাদা কথা। আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করি কিছু মনে করবেন না। শকুন্তলা দেবী সুন্দরী এবং আধুনিকা, পাটনা শহরে তাঁর অনুরাগী এডমায়ারার নিশ্চয় আছে ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তা আছে। শুনেছি রোজ সন্ধ্যেবেলা দু'চারজন পয়সাওয়ালা আধুনিক ছোকরা দীপনারায়ণের বাড়িতে আড্ডা জমাতো। ব্রিজ খেলা, চা-কেক খাওয়া, হাসি গল্প গান—এই সব চলত। ঘোড়া জগন্নাথ বড়মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে, সেও ওদের দলে থাকত। তবে মাস ছয়েক আগে দীপনারায়ণ যখন অসুখে পড়লেন তখন ওদের আড্ডা ভেঙে গেল। দু'এক জন মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নিতে যেত। নর্মদাশঙ্কর—'

'নর্মদাশঙ্কর কে?'

'বড়মানুষের অকালকুষ্মাণ্ড ছেলে। এলাহাবাদের লোক। বিহারে জমিদারী আছে। শুধু অকালকুষ্মাণ্ড নয়—পাজি। পুলিসের খাতায় নাম আছে। একবার শিকার করতে গিয়ে একটা দেহাতি মেয়েকে নিয়ে লোপাট হয়েছিল। ব্যাপার খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, তারপর মেয়ের বাপকে টাকাকড়ি দিয়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়ে দিলে—'

'নর্মদাশঙ্কর দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে যাতায়াত করত?'

'হ্যাঁ, নর্মদাশঙ্কর বাইরে খুব চোস্ত কেতা-দুরস্ত লোক, চেহারা ভাল, মিষ্টি কথা। কিন্তু আসলে পাজির পাঝাড়া।'—পাণ্ডেজি মুখের অরুচি-সূচক একটা ভঙ্গী করিলেন—'স্ত্রী-স্বাধীনতা খুবই বাঞ্ছনীয় বস্তু, অসুবিধা এই যে ভদ্রবেশী লুচ্চাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না।'

'হুঁ। শকুন্তলা দেবী কি এদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করতেন?'

'তা করতেন। কিন্তু তাঁর সত্যিকার বদনাম কখনও শুনিনি। যারা অত উঁচুতে নাগাল পেত না তারা নিজেদের মধ্যে হাসি-মস্করা করত, টিটকিরি দিত—এই পর্যন্ত।'

'ওটা আমাদের স্বভাব—দ্রাক্ষাফল অতি বিস্বাদ ও অম্লরসে পরিপূর্ণ।' ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—'এখন তাহলে ওঠা যাক। আপনি কি আর ওদিকে যাবেন?'

'বিকেলবেলা যাব। আপনারাও যদি আসেন—'

'নিশ্চয় যাব। বাড়ির লোকগুলিকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা দরকার।'

পাঁচ

বৈকাল চারটে বাজিবার পূর্বেই পাণ্ডেজি গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'চলুন, একবার থানা হয়ে যাব। হয়তো পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে।'

তিনজনে থানায় উপস্থিত হইলাম। শহরের মাঝখানে থানা। রতিকান্ত উপস্থিত ছিল, আমাদের সসম্ভ্রমে লইয়া গিয়া নিজের অফিস ঘরে বসাইল। বলিল, 'এইমাত্র পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেলাম, কিউরারি পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।'

পাণ্ডেজি রিপোর্টের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, 'আর ওষুধ পরীক্ষার রিপোর্ট?'

'সেটা এখনও আসেনি। আমি জরুরী তাগাদা দিয়ে এসেছি। বোধহয় আজ রাত্রেই পাওয়া যাবে। ওষুধের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত ভালভাবে তদন্ত আরম্ভ করা যাচ্ছে না। তবে লোক লাগিয়েছি, কিউরারি নিয়ে কেউ চোরাকারবার করে কিনা খবর নিতে।'

পাণ্ডেজি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'ঠিক করেছ। যে চোরটার কাছে কিউরারির শিশি পাওয়া গিয়েছিল সে তো এখন জেলেই আছে। তাকে দম দিলে হয়তো খবর পাওয়া যেতে পারে কারা কিউরারির চোরাকারবার করে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খবর নিয়েছি সে কয়েদীটা এখন পাটনা জেলে নেই, বক্সার জেলে আছে।

তার সঙ্গে মুলাকাতের ব্যবস্থা করছি। ইতিমধ্যে ডাক্তার পালিতের কম্পাউণ্ডারকে জেরা করেছি।'

'কিছু পেলে?'

'কিছু না।—ওদিকে দীপনারায়ণজির বাড়ির সকলকে বাড়িতেই থাকতে বলেছি। বাইরের লোকের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি, কেবল ম্যানেজার গঙ্গাধর আর তার ছেলে লীলাধর ছাড়া।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি। তুমি আসবে নাকি?'

রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'আপনারা এগোন, আমি একটা জরুরী কাজ সেরে যাচ্ছি।' তারপর হাসিয়া ব্যোমকেশকে বলিল,—'আপনি কিছু ঠাহর করতে পারলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উহু। কিন্তু মনে হচ্ছে বাড়ির কাউকেই সন্দেহ থেকে বাদ দেওয়া যায় না।'

রতিকান্ত বলিল, 'শুধু বাড়ির লোক নয় স্টেটের কর্মচারীদেরও বাদ দেওয়া যায় না। সকলকেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ফেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।'

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল, 'ডাক্তার পালিতকে আপনার কেমন মনে হয়?'

রতিকান্ত চকিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিল, 'ডাক্তার পালিত! কিন্তু তিনি—যদি তাঁর কোনও মোটিভ থাকত, তিনি নিজের হাতে একাজ করতেন কি?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল, 'তিনি নিজের হাতে একাজ করেছেন বলেই তাঁর ওপর সন্দেহ কম হবে।—'

মোটরে ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার পালিতের ডিস্‌পেনসারি কি কাছেই?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'এই তো খানিক দূর, রাস্তাতেই পড়বে। যাবেন নাকি সেখানে?'

'চলুন, আসল অকুস্থলটা দেখে যাওয়া যাক।'

দু'তিন মিনিটের মধ্যে ডাক্তার পালিতের ডাক্তারখানায় পৌঁছিলাম। এটিও বড় রাস্তার উপর, চারিদিকে দোকানপাট, বসতবাড়ি নেই। শীতের রাত্রে আটটার মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, তখন চোরের তালা ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই অসুবিধা নাই।

ডাক্তারখানাটি নিতান্তই মামুলী। সামনে পিছনে দুটি ঘর, সামনের ঘরে রুগী আসিয়া বসে, ভিতরের ঘরে ডাক্তার বসেন। কম্পাউণ্ডার ভিতরের ঘরেই ঔষধ তৈয়ার করে।

কম্পাউণ্ডার ও ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, বাহিরের ঘরে কয়েকটি রুগীও বসিয়াছিল। আমরা গিয়া দেখিলাম, ভিতরের ঘরে ডাক্তার একটি রুগীকে লম্বা সরু টেবিলের উপর শোয়াইয়া তাহার পেট টিপিতেছেন। ঘাড় ফিরাইয়া আমাদের দেখিয়া একটু হাসিলেন, 'কী, অ্যারেস্ট করতে এসেছেন নাকি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না না, দেখতে এলাম।'

'বসুন।'

আমরা ডাক্তারের টেবিল ঘিরিয়া বসিলাম। ডাক্তার রুগীর পরীক্ষা শেষ করিয়া টেবিলে আসিয়া বসিলেন, ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া কম্পাউণ্ডারকে দিলেন। ইতিমধ্যে আমরা কম্পাউণ্ডারটিকে দেখিলাম। রোগা গাল-বসা বিহারী ছোকরা, নাম যদিও খুবলাল, কিন্তু গায়ের রঙ খুব কালো। ইউনিফর্ম পরা পাণ্ডেজিকে দেখিয়া তাহার মুখের কৃষ্ণতা আরও গাঢ় হইয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন, 'কি দেখবেন বলুন।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'যে তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল সেটা কোথায় ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'খুবলাল, তালা নিয়ে এস।'

খুবলাল ঘরের একপ্রান্তে শিশি-বোতল-ভরা শেলফের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঔষধ তৈয়ার করিতেছিল, আমরা তাহার পশ্চাদভাগ দেখিতে পাইতেছিলাম। কিন্তু মুখ দেখিতে না পাইলেও সে যে উৎকর্ণ হইয়া আমাদের কথা শুনিতেছে তাহা তাহার দেহের ভঙ্গী হইতে ধরা যাইতেছিল। ডাক্তারের আদেশে সে আসিয়া কম্পিত-হস্তে তালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া আবার ফিরিয়া গিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে লাগিল।

তালাটা সস্তা এবং মামুলী, তাহাতে একটা লোহার শিক ঢুকাইয়া মোচড় দিলে তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া যাইবে, বেশি গায়ের জোরের দরকার নাই। হইয়াছেও তাই, তালার কব্জাটা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ তালা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, তারপর রাখিয়া দিল।

'আপনার দেরাজের চাবিও তো ভেঙেছে।'

'দেরাজ ভাঙবার দরকার হয়নি, ওটা খোলাই থাকে। চাবি অনেকদিন হারিয়ে গেছে।'

পালিত দেরাজ খুলিয়া দেখাইলেন, তাহাতে দুই চারিটা কাগজপত্র ছাড়া কিছুই নাই। পালিত বলিলেন, 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সাবধান হয়েছি, আজ থেকে একজন লোক রাত্তিরে এখানে শোবে। পুরনো ওষুধগুলো সব ফেলে দিয়ে নতুন ওষুধ আনিয়েছি। বলা তো যায় না।'

পাণ্ডেজি অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার খুবলালকে দু' একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'করুন না। ওর অবশ্য একবার হয়ে গেছে, ইন্সপেক্টর চৌধুরী এক দফা জেরা করেছেন। খুবলাল !'

খুবলাল নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অধর লেহন করিয়া ভাঙা গলায় বলিল, 'হুজুর, আমার কোনও কসুর নেই।'

ব্যোমকেশ আশ্বাসের সুরে বলিল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন ? যদি দোষ না করে থাকো ভয় কিসের ? কেউ তোমার অনিষ্ট করবে না।'

খুবলাল বলিল, 'জি, আমি গরীব মানুষ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি কত টাকা মাইনে পাও ?'

খুবলাল ডাক্তারের দিকে চোরা চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'জি, ষাট টাকা। আর দশ টাকা ভাতা।'

'উপরি কিছু নেই ?'

খুবলাল সভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিল, 'জি—না।'

'তোমার বাড়িতে কে কে আছে ?'

'স্ত্রী আর একটা বাচ্ছা।'

'কত টাকা বাড়িভাড়া দাও ?'

'সাড়ে বারো টাকা।'

'সত্তর টাকায় তোমার চলে ?'

খুবলাল আবার ডাক্তারের পানে গুপ্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—'পেট চলে যায় হুজুর। ডাক্তারবাবু বলেছেন জানুয়ারি মাস থেকে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেবেন।'

ব্যোমকেশ ডাক্তারের পানে চাহিল, ডাক্তার ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল,

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। কাল রাত্রে ক'টার সময় তুমি ডাক্তারখানা বন্ধ করেছিলে?'

'জি, ঘড়ি দেখিনি। ডাক্তারবাবু রুগী দেখে ফিরে এলেন, ব্যাগ রেখে তখনি বেরিয়ে গেলেন। তখন বোধহয় সাতটা। তার পাঁচ-দশ মিনিট পরে আমিও ডাক্তারখানা বন্ধ করে বাড়ি গেলাম।'

'তখন এখানে কোনও রুগী ছিল?'

'না হুজুর!'

'আচ্ছা, কাল রাত্রে দেরাজে কত টাকা পয়সা ছিল তুমি জানো?'

খুবলালের মুখে আবার আশঙ্কার ছায়া পড়িল। সে বলিল, 'গুনিনি হুজুর, বোধহয় তিন টাকা কয়েক আনা ছিল। ডাক্তারবাবুর অনুপস্থিতিতে কয়েকটা পুরনো প্রেসক্রিপশন নিয়ে রুগী এসেছিল, তাদের ওষুধ দিয়েছিলাম আর পয়সা নিয়ে দেরাজে রেখেছিলাম।'

'দোর বেশ ভাল করে বন্ধ করেছিলে?'

'জি, হাঁ।'

'রাত্রে চাবি তোমার কাছে থাকে?'

'জি, হাঁ। সকালে আমি আগে এসে ডাক্তারখানা খুলি।'

'তুমি ডাক্তার জগন্নাথ প্রসাদকে চেনো?'

খুবলাল থতমত খাইয়া গেল, শেষে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, 'জি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, 'জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে?'

খুবলাল ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'জি, না। আমি গরীব মানুষ, তিনি ডাক্তার। তবে—তবে—'

'তবে কি?'

'তিনি কিছুদিন আগে আমাকে তাঁর বাসায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন—'

'তারপর?'

'তিনি—তিনি আমাকে এখানকার চাকরি ছেড়ে দিতে বললেন।'

ডাক্তার বিস্মিতভাবে বলিলেন, 'এটা তো নতুন শুনছি।—তুমি আমাকে বলনি কেন?'

খুবলাল অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তুমি চাকরি ছাড়লে না কেন? জগন্নাথ ডাক্তার তোমাকে অন্য চাকরি দিত।'

খুবলাল বলিল, 'তিনি আমাকে অন্য চাকরি দেবেন বলেননি, খালি এ চাকরি ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন। আমি রাজী হলাম না, তখন আমাকে ধমক-চমক করলেন, বললেন—চাকরি না ছাড়লে বিপদে পড়বে।'

'তবু তুমি চাকরি ছাড়লে না?'

খুবলাল ছলছল চক্ষে অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হুজুর, ডাক্তার পালিত আমার মা-বাপ, উনি যতদিন আমায় রাখবেন ততদিন আমি ওঁকে ছাড়ব না। ওঁর মত দয়ালু লোক—' খুবলাল চোখ মুছিতে লাগিল। ব্যোমকেশ সদয় কণ্ঠে বলিল, 'আচ্ছা, এবার তুমি যাও, কাজ কর গিয়ে।'

আমরা উঠিলাম। ডাক্তার পালিত আমাদের সঙ্গে মোটর পর্যন্ত আসিলেন, বলিতে বলিতে আসিলেন, 'খুবলাল ছেলেটা ভাল। তবে—মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা চুরি করে, দুটো ভিটামিনের বড়ি কি দু'পুরিয়া কুইনিন পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে যায়; ওটা ধর্তব্য নয়, সব

কম্পাউণ্ডারই করে। এসব গুরুতর ব্যাপারে ও আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ গাড়িতে বসিয়া হঠাৎ গলা বাড়াইয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, শকুন্তলা দেবী ক'মাস অন্তঃসত্ত্বা?'

ডাক্তার পালিত পূর্ণদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'তিন মাস।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি খুবই আশ্চর্য হয়েছেন।'

'আশ্চর্য হবারই কথা।'—বলিয়া তিনি ফিরিয়া চলিলেন।

ছয়

ডাক্তারখানা হইতে দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ি মোটরে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। এই পাঁচ মিনিট আমাদের মধ্যে একটিও কথা হইল না। সকলেই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিলাম।

ফটকের বাহিরে গাড়ি থামাইয়া অবতরণ করিলাম। দেউড়িতে টুলের উপর একটা কনস্টেবল বসিয়া ছিল, তড়াক করিয়া উঠিয়া পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন, কম্পাউণ্ডের বাইরেটা ঘুরে দেখা যাক।'

পূর্বে বলিয়াছি বাড়ির চারিদিকে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিল। আমরা পাঁচিলে ধার ঘেঁষিয়া একবার প্রদক্ষিণ করিলাম। সামনের দিকে সদর রাস্তা; দুই পাশে ও পিছনে আম-কাঁঠালের বাগান। এই অঞ্চলে আম-কাঁঠালের বাগানই বেশি এবং সব বাগানই দীপনারায়ণের সম্পত্তি। পূর্বকালে এদিকে বোধহয় লোকবসতি ছিল, কিন্তু দীপনারায়ণের পূর্বপুরুষেরা সমস্ত পাড়াটা ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া ফলের বাগানে পরিণত করিয়াছেন। পাড়ায় এখন একমাত্র বাড়ি দীপনারায়ণের বাড়ি। তবু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সুখ-সুবিধার ত্রুটি নাই; ইলেকট্রিক ও টেলিফোনের তার পাঁচিল ডিঙাইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। এমন কি একটি ডাক-বাক্স লাল কুর্তা-পরা সিপাহীর মত পাঁচিলের এক কোণে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। চিঠিপত্র ডাকে দিতে হইলে বেশি দূরে যাইতে হইবে না।

প্রাচীর প্রদক্ষিণ করিয়া ব্যোমকেশ কী দেখিল জানি না; দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই নাই। পাশে ও পিছনে আম-কাঁঠালের গাছ দেয়াল পর্যন্ত ভিড় করিয়া আসিয়াছে, দেয়াল ঘেঁষিয়া মাঠের উপর একটি পায়ে-হাঁটা সরু রাস্তা। ডাক-বাক্সের দিক হইতে পাশের দিকে যাইলে একটি খিড়কি দরজা পড়ে, বোধকরি চাকর-বাকরদের যাতায়াতের পথ। এটি ছাড়া পাশের বা পিছনের দেয়ালে যাতায়াতের অন্য পথ নাই।

খিড়কি দরজা খোলা ছিল, আমরা সেই পথেই ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ প্রবেশ করিবার সময় দরজাটিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। সেকেলে ধরনের খর্বকায় মজবুত কবাট, কবাটের পুরু তক্তার উপর মোটা মোটা পেরেক দিয়া গুল বসানো; কিন্তু তা সত্ত্বেও কবাট দুটি নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে। কবাটের মাথার কাছে শিকল ঝুলিতেছে, বোধহয় রাত্রিকালে শিকল লাগাইয়া দ্বার বন্ধ করা হয়।

খিড়কি দরজা সম্বন্ধে ব্যোমকেশের অনুসন্ধিৎসা একটু আশ্চর্য মনে হইল; তাহার মন কোন্ পথে চলিয়াছে ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। যাহোক, ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাশেই পাঁচিলের লাগাও একসারি ঘর চোখে পড়িল। ঘরগুলি দপ্তরখানা, জমিদারীর কেরানীরা এখানে বসিয়া সেরেস্তার কাজকর্ম করে। আমাদের দেখিতে পাইয়া একটি লোক সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। লোকটিকে কাল রাত্রে দেখিয়াছি, মাথায় পাগড়ি-বাঁধা ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী।

তিনি ত্বরিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, খিড়কি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আলাপ হইল। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখছি।'

ম্যানেজারের অভিজ্ঞ চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিলেও তিনি মুখে বলিলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, আসুন না আমি দেখাচ্ছি।'

ব্যোমকেশ খিড়কি দরজার দিকে আঙুল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, এ দরজাটা কি সব সময়েই খোলা থাকে ?'

ম্যানেজার একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, ঘাড় চুলকাইয়া বলিলেন, 'এঁ—ঠিক বলতে পারছি না, বোধহয় রাত্রে বন্ধ থাকে। কেন বলুন দেখি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'নিছক কৌতূহল।'

এই সময় একজন ভৃত্যকে বাড়ির পিছন দিকে দেখা গেল। ম্যানেজার হাত তুলিয়া তাহাকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে বলিলেন, 'বিষুণ, রাত্রে খিড়কি দরজা বন্ধ থাকে ?'

বিষুণও ঘাড় চুলকাইল, 'তা তো ঠিক জানি না হুজুর। বোধহয় শিকল তোলা থাকে। চৌকিদার বলতে পারবে।'

'ডাক চৌকিদারকে।' বিষুণ চৌকিদারকে ডাকিতে গেল।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'রাত্রে চৌকিদার বাড়ি পাহারা দেয় ?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। দেউড়িতে দারোয়ান থাকে, আর দু'জন চৌকিদার পালা করে পাহারা দেয়।'

অল্পক্ষণ মধ্যে বিষুণ একটি চৌকিদারকে আনিয়া উপস্থিত করিল। চৌকিদার দেখিতে তালপাতার সেপাই, কিন্তু বিপুল গোঁফ ও গালপাট্টার দ্বারা কঙ্কালসার মুখে চৌকিদার সুলভ ভীষণতা আরোপ করিবার চেষ্টা আছে, চোখ দুটি রাত্রিজাগরণ কিম্বা গঞ্জিকার প্রসাদে করমচার মত লাল। ম্যানেজার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'গজাধর সিং, রাত্রে খিড়কির দরজা খোলা থাকে, না বন্ধ থাকে ?'

গজাধর ভাঙা গলায় বলিল, 'ধর্মবিতার, কখনও খোলা থাকে, কখনও জিঞ্জির লাগানো থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তালা লাগানো থাকে না ?'

গজাধর বলিল, 'না হুজুর, অনেকদিন আগে তালা ছিল, এখন ভুংলো গিয়া। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই, আমরা দু'ভাই এমন পাহার দিই যে, একটা চুহা পর্যন্ত হাতায় ঢুকতে পারে না।'

'বটে! কি ভাবে পাহারা দাও ?'

'রাত্রি দশটা থেকে পাহারা শুরু হয় হুজুর। দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত একজন পাহারা দিই, আর দুটো থেকে ছ'টা পর্যন্ত আর একজন। দেউড়িতে ঘণ্টা বাজে আর আমরা উঠে একবার চক্কর দিই, আবার ঘণ্টা বাজে আবার চক্কর দিই। এইভাবে সারা রাত চক্কর লাগাই ধর্মবিতার।'

'তাহলে ঘণ্টা বাজার মাঝখানে কেউ যদি ভিতর থেকে বাইরে যায় কিম্বা বাইরে থেকে ভিতরে আসে তোমরা জানতে পার না ?'

'বাইরে থেকে কে আসবে হুজুর, কার ঘাড়ে দশটা মাথা ?'

'বুঝেছি। তুমি এখন যেতে পার।'

গজাধর প্রস্থান করিলে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী সাফাইয়ের সুরে বলিলেন, 'এ বাড়িতে খুব কড়া পাহারার দরকার হয় না ; চোর-ছ্যাঁচড়েরা জানে এখানে দারোয়ান চৌকিদার আছে, ধরা

পড়লে আর রক্ষে নেই। তাই তারা এদিকে আসে না। আমি আঠারো বছর এই এস্টেটে আছি, কখনো একটা কুটো চুরি যায়নি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি চুরির কথা ভাবছিলাম না। যাহোক, আসুন এবার ওদিকটা দেখা যাক।'

অতঃপর গঙ্গাধর বংশী আমাদের লইয়া চারিদিক ঘুরিয়া দেখাইলেন। দেখানোর ফাঁকে ফাঁকে মৃত প্রভুর উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিলেন ; প্রশ্ন না করিয়া মৃত্যুর কারণ জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার কৌতূহলের প্রশ্রয় দিলাম না, গভীর মনঃসংযোগে সরেজমিনে তদারক করিলাম।

বাড়ির সামনের দিকে ফুলের বাগান, পিছনে শাকসব্জীর ক্ষেত। বাড়িটি দ্বিতল এবং চক্-মেলানো, প্রায় সাত-আট কাঠা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাড়ির দুই পাশে দ্বিতলে উঠিবার দুইটি লোহার পাকানো সিঁড়ি আছে। এই পথে মেথর ঝাড়ুদার উপরতলা পরিষ্কার রাখে, কারণ পাটনায় এখনও ড্রেনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

পরিদর্শন শেষ করিয়া সদরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর রতিকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্যোমকেশের পানে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, 'বাগানে কী দেখছিলেন ? কিছু পেলেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিশেষ কিছু না। কেবল এইটুকু জানা গেল যে রাত্তিরে বাড়ির যে-কেউ খিড়কির দরজা খুলে বাইরের লোককে ভিতরে আনতে পারে।'

রতিকান্ত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, 'কিন্তু—বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে কি ?'

'থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। চলুন, এবার বাড়ির লোকগুলির সঙ্গে আলাপ করা যাক—'

বাড়িতে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, ফট্‌ফট্ শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি ফটকের দিক হইতে একটি মোটর বাইক আসিতেছে। আরূঢ় ব্যক্তিটি অপরিচিত ; চেহারাটা সুশ্রী, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ। পরিধানে সাদা ফ্ল্যানেলের প্যান্ট, গাঢ় নীল রঙের গরম ক্রিকেট কোট, গলায় লাল পশমের মাফলার, মাথায় রঙচটা ক্রিকেট ক্যাপ। পুরাদস্তুর খেলোয়াড়ের সাজ, দেখিলে মনে হয় এই মাত্র ক্রিকেটের মাঠ হইতে ফিরিতেছেন।

ঝকঝকে নূতন 'সান-বীম্' আমাদের কাছে আসিয়া থামিল, আরোহী আস্তে-ব্যস্তে অবতরণ করিলেন। পাণ্ডেজি ও রতিকান্তের ললাটে গভীর ভ্রূকুটি দেখিয়া অনুমান করিলাম, ইনি যতবড় খেলোয়াড়ই হোন, পুলিসের প্রীতিভাজন নন। পরক্ষণেই পাণ্ডেজির সম্ভাষণ শুনিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না যে এই ব্যক্তিই কুখ্যাত নারীহরণকারী নর্মদাশঙ্কর।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'নর্মদাশঙ্করবাবু, আপনার এখানে কী দরকার ?'

নর্মদাশঙ্কর সবিনয়ে নমস্কার করিয়া বলিল, 'ক্রিকেটের মাঠে খবর পেলাম দীপনারায়ণবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। শুনলাম নাকি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। শুনে আর থাকতে পারলাম না। ছুটে এলাম। কী হয়েছিল, মিঃ পাণ্ডে ?'

পান্ডেজি নীরস কণ্ঠে বলিলেন, 'মাফ করবেন, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু আপনার কি দরকার তা তো বললেন না ?'

নর্মদাশঙ্কর মুখখানিকে বিষণ্ণ করিয়া বলিল, 'দরকার আর কি, বন্ধুর বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নিতে হয়। শকুন্তলা যে কী দারুণ শোক পেয়েছেন তা তো বুঝতেই পারছি। কাল রাত্রে তাঁকে দেখেছিলাম আনন্দের প্রতিমূর্তি। তখন কে ভেবেছিল যে—তাঁর সঙ্গে

একবার দেখা হবে কি ?'

'দেখা করতে চান কেন ?'

'তাঁকে সহানুভূতি জানানো, দুটো সান্ত্বনার কথা বলা, এছাড়া আর কি ? আপনারা নিশ্চয় জানেন শকুন্তলার সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।' শকুন্তলার নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নর্মদাশঙ্করের চোখে যে ঝিলিক খেলিয়া যাইতে লাগিল তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

পাণ্ডেজি চাপা বিরক্তির স্বরে বলিলেন, 'মাফ করবেন, শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে কারুর দেখা সাক্ষাৎ হবে না, এখন ওসব লৌকিকতার সময় নয়। —রতিকান্ত, ফটকের কনস্টেবলকে বলে দাও, আমাদের অনুমতি না নিয়ে যেন কাউকে ভেতরে আসতে না দেয়।'

পাণ্ডেজির ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে নর্মদাশঙ্করের চোখে আর এক ধরনের ঝিলিক খেলিয়া গেল, কুটিল ক্রোধের ঝিলিক। কিন্তু সে বিনীতভাবেই বলিল, 'বেশ, আপনারাই তাহলে শকুন্তলাকে আমার সমবেদনা জানিয়ে দেবেন। আচ্ছা, আজ চলি। নমস্তে।'

নর্মদাশঙ্করের মোটর বাইক ফট্‌ফট্‌ করিয়া চলিয়া গেল। রতিকান্ত তাহার বিলীয়মান পৃষ্ঠের দিকে বিরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া গলার মধ্যে বলিল—'মিটমিটে শয়তান!' তারপর ফটকের কনস্টেবলকে হুকুম দিতে গেল।

ব্যোমকেশ ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাল রাত্রে নর্মদাশঙ্করবাবু কখন নেমন্তন্ন খেতে এসেছিলেন আপনি লক্ষ্য করেছিলেন কি ?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'উনি কখন এসেছিলেন তা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু সাড়ে ছ'টার সময় এসে দেখলাম, উনি শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। তখনও অন্য কোনও অতিথি আসেননি।'

'মাফ করবেন, আপনি কোথায় থাকেন ?'

ম্যানেজার সম্মুখে রাস্তার ওপারে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, 'ওই আমবাগানের মধ্যে একটা বাড়ি আছে, এস্টেটের বাড়ি, আমি তাতেই থাকি।'

'আশেপাশের আমবাগানে আরও বাড়ি আছে নাকি ?'

'আজ্ঞে না। এ তল্লাটে আর বাড়ি নেই।'

'আচ্ছা, আজ সকালে মৃত্যুর পূর্বে দীপনারায়ণবাবুকে আপনি দেখেছিলেন কি ?'

ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িলেন—'আজ্ঞে না, ডাক্তারবাবু আমার আগেই এসেছিলেন। রবিবারে সেরেস্তা বন্ধ থাকে, আমি একটু দেরি করে আসি। এসে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে।'

সাত

রতিকান্ত ফিরিয়া আসিলে আমরা সকলে মিলিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। হল-ঘরের মধ্যে ছায়ান্ধকার, মানুষ কেহ নাই। আমরা পাঁচজনে প্রবেশ করিয়া পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ম্যানেজারবাবু, আপনাকে আমরা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আপনার নিশ্চয় অন্য কাজ আছে—'

ম্যানেজার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আমার আজ কোনই কাজ নেই। আজ রবিবার, সেরেস্তা বন্ধ। নেহাৎ অভ্যাসবশেই এসেছিলাম।'

বোঝা গেল তিনি আমাদের সঙ্গ ছাড়িবেন না। তিনি গভীর মনঃসংযোগে আমাদের কথা

শুনিতেছেন এবং তাহার তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দুটি মধুসঞ্চয়ী ভ্রমরের মত আমাদের মুখের উপর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু তিনি নিজে বাক্যব্যয় করিতেছেন না। গভীর জলের মাছ।

পান্ডেজি ব্যোমকেশের পানে একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'ভাল কথা বংশীজি, আপনার সেরেস্তায় টাকাকড়ির হিসেব সব ঠিক আছে তো? হয়তো আমাদের পরীক্ষা করে দেখবার দরকার হতে পারে।'

বংশীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সব হিসেব ঠিক আছে, আপনারা যখন ইচ্ছে দেখতে পারেন।' তারপর একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'কেবল একটা হিসেবের চুক্তি হয়নি—'

'কোন্ হিসেব?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আট-দশ দিন আগে দীপনারায়ণজি আমাকে ডেকে হুকুম দিয়েছিলেন ডাক্তার পালিতকে বারো হাজার টাকা দিতে। টাকাটা ডাক্তারবাবুকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু রসিদ নেওয়া হয়নি।'

'রসিদ নেওয়া হয়নি কেন?'

'ডাক্তারবাবু টাকাটা ধার হিসেবেই চেয়েছিলেন, কিন্তু দীপনারায়ণজি ঠিক করেছিলেন টাকাটা ডাক্তারবাবুকে পুরস্কার দেবেন, তাই রসিদ নিতে মানা করেছিলেন।'

'ও—' ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিল, তারপর রতিকান্তকে বলিল, 'এবার তাহলে বাড়ির সকলকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক। তাঁরা কোথায়?'

রতিকান্ত বলিল, 'তাঁরা সবাই উপরতলায়। শোবার ঘর সব ওপরে। আপনারা বসুন, আমি একে একে ওঁদের ডেকে নিয়ে আসি। কাকে আগে ডাকব—শকুন্তলা দেবীকে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শকুন্তলা দেবীকে কষ্ট দেবার দরকার নেই, আমরাই ওপরে যাচ্ছি। দু'চারটে মামুলী কথা জিজ্ঞাসা করা বৈ তো নয়। দেবনারায়ণবাবুও বোধহয় ওপরে আছেন?'

'হ্যাঁ। চাঁদনী দেবীও আছেন।'

'তবে চলুন।' পাশের একটি ছোট ঘর হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম।

সিঁড়ির উপরে একটি ঘর, তাহার দুইদিকে দুইটি দরজা। উপরতলাটি দুই ভাগে বিভক্ত। আমরা উপরে উঠিলে রতিকান্ত বলিল, 'কোন্‌দিকে যাবেন? এদিকটা দেবনারায়ণবাবুর মহল, ওদিকটা দীপনারায়ণবাবুর।'

ব্যোমকেশ কোন্‌দিকে যাইবে ইতস্তত করিতেছে এমন সময় দেবনারায়ণের দিকের দ্বার দিয়া চাঁদনী বাহির হইয়া আসিল। তাহার হাতে এক বাটি দুধ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেখিয়া সে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া পড়িল, স্বভাববশত মাথার কাপড় টানিতে গেল, তারপর বাড়ির সাম্প্রতিক কায়দা স্মরণ করিয়া থামিয়া গেল। আমাদের মধ্যে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া জড়িতস্বরে বলিল, 'চাচিজি আজ সারাদিন এক ফোঁটা জল মুখে দেননি...তাই যাচ্ছি আর একবার চেষ্টা করতে যদি একটু দুধ খাওয়াতে পারি। চাচাজি তো গেছেন, উনিও যদি না খেয়ে প্রাণটা দেন কি হবে বলুন দেখি?' বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমরা থতমত খাইয়া গেলাম। এই একান্ত ঘরোয়া সেবার মূর্তিটিকে দেখিবার জন্য কেহই যেন প্রস্তুত ছিলাম না। গঙ্গাধর বংশী বিচলিতভাবে গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'যাও বেটি, ওঁকে আগে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা কর। কিছু না খেলে কি করে চলবে।'

চাঁদনী দুধ লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, দেবনারায়ণবাবুর কাছে আগে যাওয়া যাক।'

আমরা দেবনারায়ণের মহলে প্রবেশ করিলাম, ম্যানেজার আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

ঘরের পর ঘর, সবগুলিই দেশী বিদেশী আসবাবে ঠাসা; কিন্তু কিছুরই তেমন ছিরি-ছাঁদ নাই, সবই এলোমেলো বিশৃঙ্খল। অবশেষে বাড়ির শেষ প্রান্তে একটি পর্দা-ঢাকা দরজার সম্মুখীন হইলাম।

ঘরের ভিতর কে আছে তখনও দেখি নাই, আমাদের সমবেত পদশব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি লোক পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল, তারপর চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, তিনদিকে জানালা। মেঝের অর্ধেক জুড়িয়া পুরু গদির উপর ফরাস পাতা, তাহার উপর কয়েকটা মোটা মোটা তাকিয়া। দেবনারায়ণ মাঝখানে তাকিয়া পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশে একটু পিছনে কোঁকড়া-চুল কোঁকড়া-গোঁফ বিদূষক বেণীপ্রসাদ। আমাদের দেখিয়া বেণীপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ম্যানেজার দেবনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' দেবনারায়ণ কোনও কথা না বলিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় ব্যাঙের মত চাহিয়া রহিল।

ম্যানেজার আমাদের বসিতে বলিলেন। আমি ও ব্যোমকেশ বিছানার পাশে বসিলাম। আর সকলে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, 'ঘরে আর একজন ছিলেন—যিনি পর্দা ফাঁক করে উঁকি মেরেছিলেন—তিনি কোথায় গেলেন?'

বেণীপ্রসাদ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, 'তিনি—মানে লীলাধর'—ম্যানেজারের দিকে একটি ক্ষিপ্ত চকিত চাহনি হানিয়া সে কথা শেষ করিল—'সে পাশের ঘরে গেছে।'

ব্যোমকেশ ভাল মানুষের মত জিজ্ঞাসা করিল, 'পাশের ঘরে কী আছে?'

বেণীপ্রসাদ বলিল, 'মানে—গোসলখানা!'

ব্যোমকেশ ফিক্ করিয়া হাসিল, 'বুঝেছি। গোসলখানার লাগাও পাকানো লোহার সিঁড়ি আছে, লীলাধরবাবু সেই দিক দিয়ে বাড়ি গেছেন। কেমন?'

বেণীপ্রসাদ উত্তর দিল না, নিতম্ব চুলকাইতে চুলকাইতে ম্যানেজারের দিকে আড় চোখে চাহিতে লাগিল।

লীলাধর যে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীর পুত্র এবং দেবনারায়ণের সহকারী বিদূষক তাহা আমরা কাল রাত্রে জানিতে পারিয়াছিলাম। দেখিলাম, গঙ্গাধর বংশীর মুখ কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি উদ্গত হৃদয়াবেগ যথাসাধ্য সংযত করিয়া বেণীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরা এখানে কি করছ?'

নিতম্ব ছাড়িয়া বেণীপ্রসাদ এক হাত তুলিয়া বগল চুল্‌কাইতে আরম্ভ করিল, বলিল, 'আজ্ঞে—ছোট-মালিকের মন খারাপ হয়েছে তাই আমরা ওঁকে একটু—'

মন খারাপের উল্লেখে দেবনারায়ণের বোধহয় খুড়ার মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া হাতির মত লোকটা কাঁদিতে লাগিল।

কাল দেবনারায়ণের হাসি শুনিয়াছিলাম, আজ কান্না শুনিলাম। আওয়াজ প্রায় একই রকম, যেন এক পাল শেয়াল ডাকিতেছে।

পাঁচ মিনিট চলিবার পর হঠাৎ কান্না আপনিই থামিয়া গেল। দেবনারায়ণ রুমালে চোখ

মুছিয়া পানের ডাবা হইতে এক খাম্চা পান মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল। ব্যোমকেশ এতক্ষণ নির্বিকারভাবে দেয়ালে টাঙানো রবি বর্মার ছবি দেখিতেছিল, কান্না থামিলে সহজ স্বরে বলিল, 'দেবনারায়ণবাবু, আপনি মদ খান ?'

দেবনারায়ণবাবু বলিল, 'নাঃ। আমি ভাঙ্ খাই।'

'তবে তাকিয়ার তলায় ওটা কি ?' বলিয়া ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

বেণীপ্রসাদ ইতিমধ্যে তেরছাভাবে গোসলখানার দ্বারের দিকে যাইতেছিল, এখন সুট করিয়া অন্তর্হিত হইল। আমি নির্দিষ্ট তাকিয়া উল্টাইয়া দেখিলাম, তলায় একটি ছিপি-আঁটা বোতল রহিয়াছে ; বোতলের মধ্যে শ্বেতবর্ণ তরল দ্রব্য।

দেবনারায়ণ বোকাটে মুখে বোতলের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, 'ও তো তাড়ি। লীলাধর আর বেণীপ্রসাদ খাচ্ছিল।'

বোতলে তাড়ি। এই প্রথম দেখিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ও—আপনার মন প্রফুল্ল করবার জন্য ওঁরা তাড়ি খাচ্ছিলেন ! তা সে যাক। বলুন তো, আপনি ভাঙ্ ছাড়া আর কি কি নেশা করেন ?'

দেবনারায়ণ খানিকটা জর্দা মুখে দিয়া বলিল, 'আর কিছু না।'

'কোকেন ?'

'বুকনি ? নাঃ।'

'গাঁজা ?'

'নাঃ। গজাধর গাঁজা খায়।'

'আচ্ছা, যেতে দিন। —আপনার বোধহয় অনেক বন্ধু আছে ?'

'বন্ধু—আছে। লাখো লাখো বন্ধু আছে।'

'তাই নাকি ? তাদের দু'চারটে নাম করুন তো।'

'নাম ? লীলাধর—বেণীপ্রসাদ—গজাধর সিং—'

'কোন্ গজাধর সিং ?'

'চৌকিদার। খুব ভাল ভাঙ্ ঘুঁটতে পারে।'

'আর কে ?'

'আর বদ্রিলাল। রোজ আমার পা টিপে দেয়।'

দেবনারায়ণের বন্ধুরা কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝলাম। ডাক্তার পালিতের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব নেই ?'

দেবনারায়ণের বিপুল শরীর একবার ঝাঁকানি দিয়া উঠিল ; সে বিহ্বলকণ্ঠে বলিল, 'ডাক্তার পালিত। ওকে আমি রাখব না, তাড়িয়ে দেব। চাচাকে ও খুন করেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকাইয়া মুদিত চক্ষে বসিয়া রহিল, তারপর চোখ খুলিয়া বলিল, 'আপনার কাকার মৃত্যুর পর আপনি ষোল আনা সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এখন কি করবেন ?'

'কি করব ?'—দেবনারায়ণ যেন পূর্বে একথা চিন্তাই করে নাই এমনিভাবে ইতি-উতি তাকাইতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, দেবনারায়ণ কি সত্যই এতবড় গবেট ?

ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'চলুন, এর কাছে আর কিছু জানবার নেই।'

দরজার দিকে ফিরিতেই দেখিলাম, চাঁদনী কখন পর্দার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার ব্যঞ্জনা। আমাদের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতেই সে চকিতে সরিয়া গেল।

আমরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। রতিকান্ত পাণ্ডেজিকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, 'চাঁদনী দেবীকে সওয়াল করা হবে নাকি?'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন। ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'পরে দেখা যাবে। এখন চলুন, শকুন্তলা দেবীর মহলে।'

আট

দেবনারায়ণের মহল হইতে শকুন্তলার মহলে যাইবার পথে ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী হঠাৎ আমাদের নিকট বিদায় লইলেন। পুত্র লীলাধর সম্পর্কে তাঁহার মন বোধহয় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নহিলে এত সহজে আমাদের ছাড়িয়া যাইতেন না। বলিলেন, 'আমার সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হল, আমি এবার যাই। আপনারা কাজ করুন।'

তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন। আমরা শকুন্তলা দেবীর মহলে প্রবেশ করিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, রতিকান্ত সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিতে জ্বালিতে আমাদের আগে আগে চলিল।

প্রথমে একটি মাঝারি গোছের ঘর। দেশী প্রথায় চৌকির উপর ফরাসের বিছানা, কয়েকটি গদি-মোড়া নীচু কেদারা, ঘরের কোণে উঁচু টিপাইয়ের মাথায় রূপার পাত্রে ফুল সাজানো। দেয়ালে যামিনী রায়ের আঁকা একটি ছবি। এখানে বাড়ির লোকেরা বসিয়া গল্প-গুজবে সন্ধ্যা কাটাইতে পারে, আবার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব আসিলেও বসানো যায়।

ঘরে কেহ নাই। আমরা এ-ঘর উত্তীর্ণ হইয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। এটি বেশ বড় ঘর, দুটি পালঙ্ক দু'পাশের দেয়ালে সংলগ্ন হইয়া আছে। একটি বড় ওআর্ডরোব রহিয়াছে, একটি আয়না-দার টেবিলে কয়েকটি ওষুধের শিশি। মনে হয় এটি দীপনারায়ণের শয়নকক্ষ ছিল। বর্তমানে শয্যা দুটির উপর সুজনি ঢাকা রহিয়াছে। এ ঘরটিও শূন্য। ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল,—'এটি বোধ হচ্ছে দীপনারায়ণবাবুর শোবার ঘর ছিল। দুটো খাট কেন?'

রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—'দীপনারায়ণজির অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল তখন একজন নার্স রাত্রে থাকত।'

'ঠিক ঠিক, আমার বোঝা উচিত ছিল।'

অতঃপর আমরা তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিলাম এবং চারিদিকে চাহিয়া চমৎকৃত হইয়া গেলাম। এ ঘরটি আরও বড় এবং নীলাভ নিঅন-লাইট দ্বারা আলোকিত। পিছনের দিকের দেয়ালে সম-ব্যবধানে তিনটি জানালা, জানালার ব্যবধানস্থলে সুচিত্রিত মহার্ঘ মিশরী গালিচা ঝুলিতেছে। ঘরের এক পাশে একটি অর্গান এবং তাহার আশেপাশে দেয়ালে টাঙানো নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। ঘরের অপর পাশে ছবি আঁকার বিবিধ সরঞ্জাম, দেয়ালের গায়ে আঁকা একটি প্রশস্ত তৈলচিত্র। মেঝের উপর পুরু মখমলের আস্তরণ বিছানো, তাহার মাঝখানে গুরু নিতম্বিনী রাজকন্যার মত একটি তানপুরা শুইয়া আছে। বুঝিতে বিলম্ব হয় না কলা-কুশলী শকুন্তলার এটি শিল্পনিকেতন। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একই বাড়ির দুই অংশে রুচিনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্য-বোধের কতখানি তফাৎ, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রথমেই দেয়ালে আঁকা তৈলচিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে কোনও দিকে না চাহিয়া ছবির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ছবিটির খাড়াই তিন ফুট, পাশাপাশি পাঁচ ফুট। বিষয়বস্তু নূতন নয়, বল্কলধারিণী শকুন্তলা তরুআলবালে জল-সেচন করিতেছে এবং দুষ্মন্ত পিছনের একটি বৃক্ষকাণ্ডের আড়াল হইতে চুরি করিয়া শকুন্তলাকে দেখিতেছেন।

ছবিখানির অঙ্কন-শৈলী ভাল, শকুন্তলার হাত পা খ্যাংরা কাটির মত নয়, দুষ্মন্তকে দেখিয়াও যাত্রাদলের দুঃশাসন বলিয়া ভ্রম হয় না। চিত্রের বাতাবরণ পুরাতন, কিন্তু মানুষ দুটি সর্বকালের। ছবি দেখিয়া মন তৃপ্ত হয়।

ব্যোমকেশের দিকে চোখ ফিরাইয়া দেখিলাম সে তন্ময় হইয়া ছবি দেখিতেছে। তাহার দেখাদেখি রতিকান্ত ও পাণ্ডেজি আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ তখন তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, 'চমৎকার ছবি। কে এঁকেছে?'

পাণ্ডেজি রতিকান্তের দিকে চাহিলেন, রতিকান্ত দ্বিধাভরে বলিল, 'বোধহয় শকুন্তলা দেবীর আঁকা। ঠিক বলতে পারি না।'

ব্যোমকেশ আবার ছবির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'তাই হবে। একালের শকুন্তলা সেকালের শকুন্তলার ছবি এঁকেছেন। দেখেছ অজিত, তপোবনকন্যা শকুন্তলার মুখে কী শান্ত সরলতা, দুষ্মন্তের চোখে কী মোহাচ্ছন্ন অনুরাগ, সহকার তরুগুলির কী সজীব শ্যামলতা। সব মিলিয়ে সংসার ও আশ্রমের একটি অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে।—যদি সম্ভব হত ছবিটি তুলে নিয়ে যেতাম।'

একটু অবাক হইলাম। ব্যোমকেশের মনে শিল্পরস বোধ থাকিতে পারে কিন্তু তাহা কোনও কালেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে দেখি নাই। আমি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছি দেখিয়া সে সামলাইয়া লইল; ছবির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ঘরের চারিদিকে চোখ বুলাইল। শকুন্তলা দেবীর বর্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া একটু ব্যথিত স্বরে বলিল, 'এটা দেখছি শকুন্তলা দেবীর গান-বাজনা ছবি-আঁকার ঘর...সাজানো বাগান...ভুলে থাকার উপকরণ—' একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চলুন।'

অতঃপর আমরা আরও একটা শূন্য ঘর এবং একটা বারান্দা পার হইয়া শকুন্তলার শয়নকক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা ভেজানো ছিল, রতিকান্ত টোকা দিলে একটি মধ্যবয়স্কা দাসী দ্বার খুলিয়া দিল। রতিকান্ত ঘরের ভিতর গলা বাড়াইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'আমরা পুলিসের পক্ষ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।'

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর হইতে অস্ফুট আওয়াজ আসিল—'আসুন।'

আমরা সসঙ্কোচে ঘরে প্রবেশ করিলাম। রতিকান্ত দাসীকে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল, দাসী বাহিরে গেল।

শকুন্তলা দেবীর শয়নকক্ষের বর্ণনা দিব না। অনবদ্য রুচির সহিত অপরিমিত অর্থবল সংযুক্ত হইলে যাহা সৃষ্টি হয় এ ঘরটি তাহাই। শকুন্তলা পালঙ্কের উপর বসিয়া ছিলেন, আমরা প্রবেশ করিলে একটি ক্রীম রঙের কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়াইয়া লইলেন। কেবল তাঁহার মুখখানি খোলা রহিল। মোমের মত অস্বচ্ছাভ বর্ণ, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। চুলগুলি শিথিল ও অবিন্যস্ত। যেন হিম-ক্লিন্ন ঝরা শেফালি।

'বসুন'—শকুন্তলা ক্লান্তি-বিনত চক্ষু দুটি একবার আমাদের পানে তুলিলেন।

ঘরে কয়েকটি চামড়ার গদি-মোড়া নীচু চৌকি ছিল, আমি ও ব্যোমকেশ দুটি চৌকি খাটের কাছে টানিয়া লইয়া বসিলাম। রতিকান্ত ও পাণ্ডেজি খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজির দিকে দৃষ্টি তুলিয়া নীরবে অনুমতি চাহিল, পাণ্ডেজি একটু ঘাড় নাড়িলেন। ব্যোমকেশ তখন অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে শকুন্তলাকে বলিল, 'আপনাকে এ সময়ে বিরক্ত করতে এসেছি, আমাদের ক্ষমা করবেন। মানুষের জীবনে কখন যে কী দুর্দৈব ঘটবে কেউ জানে না, তাই আগে থাকতে প্রস্তুত থাকবার উপায় নেই। আপনার স্বামীকে আমি একবার মাত্র দেখেছি, কিন্তু তিনি যে কি রকম সজ্জন ছিলেন তা জানতে বাকি নেই। তাঁর

মৃত্যুর জন্যে যে দায়ী সে নিষ্কৃতি পাবে না এ আশ্বাস আপনাকে আমরা দিচ্ছি।' শকুন্তলা উত্তর দিলেন না, কাতর চোখ দুটি তুলিয়া নীরবে ব্যোমকেশকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করব। নেহাত প্রয়োজন বলেই করব, আপনাকে উত্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।—কিন্তু আসল প্রশ্ন করার আগে একটা অবান্তর কথা জেনে নিই, ও ঘরের দেয়ালে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ছবিটি কি আপনার আঁকা?'

শকুন্তলার চোখে চকিত বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, তিনি কেবল ঘাড় হেলাইয়া জানাইলেন—হ্যাঁ, ছবি তাঁহারই রচনা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চমৎকার ছবি, আপনার সত্যিকার শিল্পপ্রতিভা আছে। কিন্তু ওকথা যাক। দীপনারায়ণবাবু উইল করে গেছেন কিনা আপনি জানেন?'

এবার শকুন্তলা অবুঝের মত চক্ষু তুলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'এসব আমি কিছু জানি না। উনি আমার কাছে বিষয় সম্পত্তির কথা কখনও বলতেন না।'

'আপনার নিজস্ব কোনও সম্পত্তি আছে কি?'

'তাও জানি না। তবে—'

'তবে কি?'

'বিয়ের পর আমার স্বামী আমার নামে পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি! সে টাকা এখন কোথায়?'

'ব্যাঙ্কেই আছে। আমি কোনও দিন সে টাকায় হাত দিইনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল।

'তাহলে এই পাঁচ লাখ টাকা আপনার নিজস্ব স্ত্রীধন। তারপর যদি আপনার পুত্রসন্তান জন্মায় তাহলে সে এজমালি সম্পত্তির অর্ধেক ভাগ পাবে।'

শকুন্তলা চোখ তুলিলেন না, নতনেত্রে রহিলেন। মনে হইল তাঁহার মুখখানা আরও পাণ্ডুর রক্তহীন হইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, আপনি যে সন্তান-সম্ভবা একথা আপনার স্বামী জানতেন?'

নতনয়না শকুন্তলার ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, 'জানতেন। কাল রাত্রে তাঁকে বলেছিলাম।'

'কাল রাত্রে! খাওয়া-দাওয়ার আগে, না পরে?'

'পরে। উনি তখন শুয়ে পড়েছিলেন।'

'খবর শুনে উনি নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছিলেন!'

'খুব খুশি হয়েছিলেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন—'

এই পর্যন্ত বলিয়া শকুন্তলার ভাব হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। এতক্ষণ তিনি ক্লান্ত ম্রিয়মাণভাবে কথা বলিতেছিলেন, এখন ভয়ার্ত বিহ্বলতায় একে একে আমাদের মুখের পানে চাহিলেন, তারপর একটি অবরুদ্ধ কাতরোক্তি করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আমরা ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, দ্বারের কাছে চাঁদনী কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন সে ছুটিয়া আসিয়া শকুন্তলার মাথা কোলে লইয়া বসিল, আমাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'আপনারা কি রকম মানুষ, মেরে ফেলতে চান ওঁকে? যান, শীগ্‌গির যান এ ঘর থেকে। শরীরে একটু দয়ামায়া কি নেই আপনাদের? এখুনি মিস্ মান্নাকে খবর পাঠান।'

আমরা পালাইবার পথ পাইলাম না। নীচে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইলাম চাঁদনী উচ্চকণ্ঠে দাসীকে ডাকিতেছে—'সোমরিয়া, কোথায় গেলি তুই—শীগ্‌গির জল আন—'

নীচে নামিয়া পাণ্ডেজি প্রথমেই মিস্ মান্নাকে টেলিফোন করিলেন—'শীগ্‌গির চলে আসুন, আপনি না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে অপেক্ষা করছি।'

তারপর আমরা হল-ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রাত্রি হইয়া গিয়াছে, ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া গেল।

পাণ্ডেজি বিললেন, 'রতিকান্ত, দেখে এস শকুন্তলা দেবীর জ্ঞান হল কিনা।'

রতিকান্ত চলিয়া গেল। ব্যোমকেশ বিমর্ষ মুখে বসিয়াছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, 'পাণ্ডেজি, মিস্ মান্নাকে এখন কিছুদিন শকুন্তলা দেবীর কাছে রাখা দরকার, তার ব্যবস্থা করুন। তিনি সর্বদা শকুন্তলার কাছে থাকবেন, একদণ্ডও তাঁর কাছ-ছাড়া হবেন না।'

'বেশ।'

ম্যানেজার গঙ্গাধর এই সময় ফিরিয়া আসিলেন এবং শকুন্তলার মূর্ছার কথা শুনিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'মিস্ মান্নাকে এখানে কিছুদিন রাখার ব্যবস্থা করুন। শকুন্তলা-দেবী অন্তঃসত্ত্বা, তার ওপর এই দুর্দৈব। ওঁর কাছে অষ্টপ্রহর ডাক্তার থাকা দরকার।'

ম্যানেজারের মুখখানা কেমন একরকম হইয়া গেল। তারপর তিনি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

মিস্ মান্না আসিলেন, হাতে ওষুধের ব্যাগ। তাঁহাকে সংক্ষেপে সব কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, 'বেশ, আমি থাকব। আমার কিছু জিনিসপত্র আনিয়ে নিলেই হবে।'

তিনি দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেলেন।

দশ মিনিট পরে রতিকান্ত নামিয়া আসিয়া বলিল, 'জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার মান্না বললেন ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

পাণ্ডেজি গাত্রোত্থান করিলেন।

'আমরা এখন উঠলাম। রতিকান্ত, তুমি এখানকার কাজ সেরে একবার আমার বাসায় যেও।' আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'চলুন, আমার ওখানে চা খাবেন।'

নয়

মোটরে যাইতে যাইতে শকুন্তলার শয়নকক্ষের দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। মনে হইল যেন একটি মর্মস্পর্শী নাটকের নিগূঢ় দৃশ্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করিলাম। শকুন্তলা যদি মূর্ছিত হইয়া না পড়িতেন এবং চাঁদনী আসিয়া যদি রসভঙ্গ না করিত—

শকুন্তলা হঠাৎ মূর্ছিত হইলেন কেন ? অবশ্য এরূপ অবস্থায় যে-কোনও মুহূর্তে মূর্ছা যাওয়া বিচিত্র নয়, তবু শোকের প্রাবল্যই কি তাহার একমাত্র কারণ ?

ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে চিন্তার অতলে তলাইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শকুন্তলার মূর্ছার কথা ভাবছ নাকি ?'

সে সচেতন হইয়া বলিল, 'মূর্ছা। না—আমি ভাবছিলাম ডাক-বাক্সর কথা।'

অবাক হইয়া বলিলাম, 'ডাক-বাক্সর কথা ভাবছিলে!'

সে বলিল, 'হ্যাঁ, দীপনারায়ণের বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্স আছে তারই কথা। ভারি লাগসৈ জায়গায় সেটা আছে। দেখলে মনে হয় লাল কুর্তা-পরা গোলগাল একটি সেপাই রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়।'

'আসলে তবে কি ?'

'আসলে শ্রীরাধিকার দূতী।'

'বুঝলাম না। ব্যাসকূট ছেড়ে সিধে কথা বল।'

ব্যোমকেশ কিন্তু সিধা কথা বলিল না, মুখে একটা একপেশে হাসি আনিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'অভিসারের আইডিয়াটি ভারি মিষ্টি, অবশ্য যদি অভিসারিকা পরস্ত্রী হয়। নিজের স্ত্রী অভিসার করলে বোধহয় তত মিষ্টি লাগে না।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্'।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ!'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলিল, 'আবোল-তাবোল নয়, এটা গীতগোবিন্দ। যদি আবোল-তাবোল শুনতে চাও শোনাতে পারি, ছন্দ একই। বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে—'

পাণ্ডেজি মোটর চালাইতে চালাইতে হাসিয়া উঠিলেন। আমি হতাশ হইয়া আপাতত আমার কৌতূহল সম্বরণ করিলাম।

পাণ্ডেজির বাসায় পৌঁছিয়া দেখা গেল চা প্রস্তুত। তার সঙ্গে গরম গরম বেগুনি, পকৌড়ি, ডালের ঝালবড়া। ব্যোমকেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিয়া গেল। আমরাও যোগ দিলাম।

বেশ খানিকটা রসদ আত্মসাৎ করিবার পর ব্যোমকেশ তৃপ্তস্বরে বলিল, 'এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, আমার অন্তরাত্মা এই জিনিসগুলির পথ চেয়ে ছিল।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া বলিলেন, 'এখন তো পথ চাওয়া শেষ হল, এবার বলুন কি দেখলেন শুনলেন।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় লম্বা একটি চুমুক দিয়া সযত্নে পেয়ালা নামাইয়া রাখিল, গড়গড়ার নলে কয়েকটা বুনিয়াদি টান দিল, তারপর চিন্তা-মন্থর কণ্ঠে বলিল, 'দেখলাম শুনলাম অনেক কিছু, কিন্তু এখনও শেষ দেখা যাচ্ছে না।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। এক—টাকা, দুই—স্মরগরল। কোন্‌দিকের পাল্লা ভারী এখনও বুঝতে পারছি না। হতে পারে, দুটো মোটিভ জড়াজড়ি হয়ে গেছে।'

আমি বলিলাম, 'মোটিভ যেমনই হোক, লোকটা কে?'

ব্যোমকেশ একটু অধীরভাবে বলিল, 'তা কি করে বলব? যে-ব্যক্তি ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়েছিল সে ভাড়াটে লোক হতে পারে। যে তাকে নিয়োগ করেছিল তাকেই আমরা খুঁজছি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা যাদের চিনি তাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিয়োগ করতে পারে। এক আছে দেবনারায়ণ। কিন্তু সে কি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, প্রথমে দেবনারায়ণকে ধরুন। দেবারায়ণকে দেখলে মনে হয় নিরেট আহাম্মক; কিন্তু এটা তার ছদ্মবেশ হতে পারে। সেই হয়তো লোক লাগিয়ে খুড়োকে মেরেছে। তার আজ্ঞাবহ মোসাহেবের অভাব নেই, লীলাধর বংশী বা বেণীপ্রসাদ যে-কেউ পুরস্কারের আশ্বাস পেলে খুন করবে। এখানে মোটিভ হল, সম্পত্তির একাধিপত্য।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া আমাকে নিবারণ করিল—'তারপর ধরা যাক—চাঁদনী।'

'চাঁদনী!'

'হ্যাঁ, চাঁদনী। শকুন্তলার প্রতি তার এত দরদ স্বাভাবিক মনে হয় না, যেন একটু

বাড়াবাড়ি। সে হয়তো মনে মনে তাঁকে হিংসে করে, তাঁর প্রাধান্য খর্ব করতে চায়। দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর শকুন্তলা আর সংসারের কর্ত্রী থাকবেন না, কর্ত্রী হবে চাঁদনী। দেবনারায়ণ যদি সত্যি সত্যিই ন্যালা-ক্যাবলা হয়, সে চাঁদনীর মুঠোর মধ্যে থাকবে, চাঁদনী হবে বিপুল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধীশ্বরী—'

'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ আবার হাত তুলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিল।

'তারপর ধরুন—ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী। ডাক্তার পালিতের মতে ইনি গভীর জলের মাছ। সেটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, গভীর জলের মাছ না হলে এতবড় স্টেটের ম্যানেজার হওয়া যায় না। কিন্তু উনি যদি কুমীর হন তবেই ভাবনার কথা। ভেবে দেখুন দীপনারায়ণ সিং বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, বিষয় সম্পত্তির ওপর নজর রাখতেন। তিনি বেঁচে থাকতে পুকুর চুরি সম্ভব নয়, অল্পসল্প চুরি হয়তো চলে। কিন্তু তিনি যদি মারা যান তাহলে সমস্ত সম্পত্তি অর্শাবে দেবানারাণকে। তখন দু'হাতে চুরি করা চলবে। সুতরাং ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীরও মোটিভ স্বীকার করতে হবে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গড়গড়া টানিল, আমরা নীরব রহিলাম। তারপর সে গড়গড়ার নল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'সর্বশেষে ধরুন—শকুন্তলা দেবী।'

এইটুকু বলিয়া সে চুপ করিল। আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। সে একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, 'কোনও মহিলার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা ভদ্রলোকের কাজ নয়, কিন্তু যেখানে একটা খুন হয়ে গেছে, সেখানে আলোচনা না করেও উপায় নেই। শকুন্তলা দেবী তিন মাস অন্তঃস্বত্ত্বা, অথচ তিন মাস আগে দীপনারায়ণ সিং শয্যাগত ছিলেন, সে সময়ে তাঁর দীর্ঘ রোগের একটা ক্রাইসিস যাচ্ছিল।...শকুন্তলা আজ আমাদের বললেন, কাল রাত্রে তিনি স্বামীকে সন্তান সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন, শুনে দীপনারায়ণ সিং আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন।...কথাটা বোধহয় সত্যি নয়।'

প্রশ্ন করিলাম, 'সত্যি নয় কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দীপনারায়ণ সিং যদি আনন্দে আত্মহারা হয়েই পড়েছিলেন তবে এই মহা আনন্দের সংবাদ কাউকে দিলেন না কেন? রাত্রে না হোক, সকালবেলা ডাক্তার পালিতকে তো বলতে পারতেন, শুভসংবাদ পাকা কিনা জানবার জন্য মিস্ মান্নাকে ডাকতে পারতেন।...শকুন্তলা স্বামীকে বলেননি, কারণ স্বামীকে বলবার মত কথা নয়। দীপনারায়ণ সিং জানতে পারলে শকুন্তলাকে খুন করতেন, নচেৎ বাড়ি থেকে দূর করে দিতেন। তাই জানাজানি হবার আগেই দীপনারায়ণ সিংকে সরানো দরকার হয়েছিল।'

বলিলাম, 'কিন্তু ধরো, ডাক্তার পালিত যদি ভুল করে থাকেন?'

ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলিল, 'ডাক্তার পালিত এবং মিস্ মান্না দু'জনেই যদি ভুল করে থাকেন, যদি শকুন্তলা নিষ্কলঙ্ক হন, তাহলে দীপনারায়ণকে খুন করার তাঁর কোনও মোটিভ নেই। কিন্তু ডাক্তার পালিত বা মিস্ মান্না দায়িত্বহীন ছেলেমানুষ নয়, তাঁরা ভুল করেননি। ইচ্ছে করেও মিছে কথাও বলেননি, যে মিছে কথা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে তেমন মিথ্যে কথা বলবার লোক ওঁরা নন।'

বলিলাম, 'আমি ওকথা বলছি না। শকুন্তলা যে অন্তঃস্বত্ত্বা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দীপনারায়ণ যে—'

'তুমি যা বলতে চাও আমি বুঝেছি। কিন্তু সে দিকেও বাড়িসুদ্ধ লোক সাক্ষী আছে, ডাক্তার

পালিত মিছে কথা বলে পার পাবেন না।' ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে গড়গড়ার নল লইয়া আবার টানিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'বেশ, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে শকুন্তলার একটি দুষ্মন্ত আছে। কিন্তু সে লোকটা কে?'

ব্যোমকেশ একটু চকিতভাবে আমার পানে চাহিল, অর্ধব্যক্ত স্বরে বলিল, 'শকুন্তলার দুষ্মন্ত! বেশ বলেছ।—ওই দুষ্মন্তকেই আমরা খুঁজছি। ডাক্তার পালিতের ব্যাগে যে ওষুধের বদলে বিষ রেখে গিয়েছিল সে ওই দুষ্মন্ত ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'দুষ্মন্তটি তবে কে?'

'সেটা শকুন্তলার রুচির ওপর নির্ভর করে। তিনি মার্জিত রুচির আধুনিকা মহিলা, সুতরাং দুষ্মন্তও আধুনিক শিক্ষিত লোক হওয়া সম্ভব। নর্মদাশঙ্কর বা তাদের দলের কেউ হতে পারে। আবার এমন লোক হতে পারে যার প্রকাশ্যভাবে ও বাড়িতে যাতায়াত নেই।'

পাণ্ডেজি কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিলেন, বলিলেন, 'কিম্বা মনে করুন, যদি এমন কেউ হয় যে শকুন্তলাকে বিপদে ফেলে সরে পড়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুষ্মন্তদের পক্ষে সেটা খুবই স্বাভাবিক। তখন শকুন্তলাকে অন্য চেষ্টা করতে হবে, অর্থাৎ অন্য সহকারী যোগাড় করতে হবে।'

'সে-রকম সহকারী তিনি পাবেন কোথায়?'

'কেন সহকারীর অভাব কিসের? স্বয়ং গঙ্গাধর বংশী রয়েছেন, তস্য পুত্র লীলাধর আছে, বেণীপ্রসাদ আছে, উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে সকলেই রাজী হবে। এমন কি ডাক্তার পালিত আর মিস্ মান্নাকেও বাদ দেওয়া যায় না। ঠক বাছতে গাঁ উজোড়।' আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের গড়গড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই। তারপর সে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলিল, 'দেয়ালে আঁকা ছবিটার কথা বার বার মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে ওটা শুধু ছবি নয়, ওর মধ্যে শিল্পীর অন্তরতম কথাটি লুকিয়ে আছে। ছবিটি দিনের আলোয় আর একবার ভাল করে দেখতে হবে।'

ভৃত্য আসিয়া জানাইল, ইন্সপেক্টর চৌধুরী আসিয়াছেন।

দশ

রতিকান্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'এই মাত্র কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট দিয়ে গেল। ওষুধে বিষ পাওয়া যায়নি।'

আমরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। লিভারের ভায়ালে কিউরারি পাওয়া যাইবে এ বিষয়ে আমরা এতই নিশ্চিন্ত ছিলাম যে কথাটা হঠাৎ বোধগম্য হইল না।

'বিষ পাওয়া যায়নি?'

'না। এই দেখুন রিপোর্ট।' রতিকান্ত ব্যোমকেশের হাতে এক টুকরা কাগজ দিল।

রিপোর্টে কোন বিষের নামগন্ধ নাই, নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক লিভারের আরক। ব্যোমকেশ কুঞ্চিতচক্ষে পাণ্ডেজি ও রতিকান্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

'ভারি আশ্চর্য।'

রতিকান্ত একবার গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এ থেকে আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে আপনি বলুন আপনার কি মনে হয়?'

বোধ হইল রতিকান্ত মনে মনে খুশি হইয়াছে। সে একটি চেয়ারের কিনারায় বসিল, কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে একদিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'দীপনারায়ণজি কিউরারি বিষে মারা গেছেন তাতে সন্দেহ নেই। পোস্ট-মর্টেমে বিষ পাওয়া গেছে। তাঁর শরীরে বিষ প্রবেশ করল কি করে? ইন্‌জেকশন ছাড়া অন্য উপায়ে প্রবেশ করতে পারে না। অথচ যে ভায়াল থেকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়েছিল তাতে বিষ পাওয়া গেল না—' রতিকান্ত একটু ইতস্তত করিল—'এ থেকে একমাত্র অনুমান করা যায়, ডাক্তার পালিত যে ভায়াল থেকে ইন্‌জেকশন দিয়েছিলেন সে ভায়াল আমাদের দেন্‌নি, অন্য ভায়াল দিয়েছিলেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিন্তু কেন? তাতে ওঁর লাভ কি?'

রতিকান্ত একটু উদ্বিগ্নভাবে বলিল, 'লাভ এই হতে পারে যে, আমরা মনে করব ইন্‌জেকশনের জন্য মৃত্যু হয়নি।'

'ডাক্তার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না কি? দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর ঘরে অনেক লোক এসেছিল, গোলমালের মধ্যে হয়তো কেউ ভায়ালটা সরিয়েছে।'

'অসম্ভব নয়, কিন্তু—'

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'আপনি মনে করেন ডাক্তার পালিতই প্রকৃত অপরাধী?'

রতিকান্ত একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আজ থানায় আপনি ডাক্তার পালিত সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করলেন সেটা আমার মাথায় ঘুরছিল, তারপর অ্যানালিসিসের রিপোর্ট পেয়ে মনে হল ডাক্তার পালিত যদি নির্দোষ হন তবে সিধা পথে চলছেন না কেন? এ অবস্থায় তাঁর ওপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য দীপনারায়ণজির মৃত্যুতে ওঁর ব্যক্তিগত কোনও লাভ নেই। কিন্তু যাদের লাভ আছে তারা ওঁকে টাকা খাইয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করিয়ে নিতে পারে। হয়তো ওঁকে পঞ্চাশ হাজার কি এক লাখ টাকা খাইয়েছে। টাকার জন্যে মানুষ কি না করে।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল, 'ঠিক কথা, টাকার জন্যে মানুষ কি না করে। ডাক্তার পালিত যদি টাকা খেয়ে একাজ করে থাকেন তাহলে শুধু ডাক্তার পালিতকে ধরলেই চলবে না, যে টাকা খাইয়েছে তাকেও ধরতে হবে। কে তাঁকে টাকা খাইয়েছে আপনি কিছু আন্দাজ করেছেন?'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দেবানারায়ণ ছাড়া আর কে হতে পারে।'

'আপাতত তাই মনে হয় বটে, কিন্তু প্রমাণ কৈ? প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে কি?'

'প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায়নি।'

রতিকান্ত পাণ্ডেজির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আজ রাত্রি একটার ট্রেনে আমি বক্সার যাচ্ছি। কয়েদীটাকে জেরা করে যদি জানতে পারা যায় যে ডাক্তার পালিত কিউরারি কিনেছেন—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'তাহলে অনেকটা সুরাহা হতে পারে। তুমি ফিরবে কবে?'

'কাল সন্ধ্যে নাগাদ ফিরতে পারব বোধহয়।—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারীকে থানার চার্জে রেখে যাচ্ছি।'

'বেশ।—এদিকের কি ব্যবস্থা করলে?'

'দীপনারায়ণজির বাড়িতে একজন হেড কনস্টেবলের অধীনে চারজন কনস্টেবল বসিয়ে যাচ্ছি, তারা চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকবে। আপনি তো মিস্ মান্নাকে শকুন্তলা দেবীর কাছে রাত্রে থাকতে বলে এসেছেন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'হ্যাঁ, মিস্ মান্না এখন কিছুদিন শকুন্তলার কাছেই থাকবেন। তুমি তো শুনেছ শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রতিকান্ত ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিল, 'শুনেছি। দীপনারায়ণজি সন্তানের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি দেখে যেতে পেলেন না।'

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিল। রতিকান্ত উঠিয়া পড়িল, 'যাই, আমাকে আবার তৈরি হতে হবে। আপনারা এদিকে একটু নজর রাখবেন।' হাসিমুখে স্যালুট করিয়া রতিকান্ত চলিয়া গেল।

দেখিলাম রতিকান্তের ব্যবহার এবেলা অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। সে প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হইয়াছিল। তাহার এলাকার মধ্যে ব্যোমকেশের আবির্ভাব মনে মনে পছন্দ করে নাই ; এখন বোধহয় সে বুঝিয়াছে ব্যোমকেশ তাহার কৃতিত্বে ভাগ বসাইতে চায় না, তাই নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার পালিতের ব্যবহারে সঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে না। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, মৃত্যুর কারণ কিউরারি এবং তাঁর ইন্‌জেকশনের ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তবে আবার তিনি ওষুধের ভায়াল বদলে দিলেন কেন ?' ব্যোমকেশ আবার চক্ষু মুদিত করিল।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল। ভৃত্য আসিয়া বলিল, ডাক্তার পালিত আসিয়াছেন। ব্যোমকেশের চট্ করিয়া সমাধিভঙ্গ হইল, সে মৃদুকণ্ঠে পাণ্ডেজিকে বলিল, 'ডাক্তারকে এসব বলে কাজ নেই।'

ডাক্তার পালিত আসিলে পাণ্ডেজি তাঁহাকে সমুচিত শিষ্টতা সহকারে বসাইলেন।

ডাক্তার ক্লান্তভাবে বলিলেন, 'প্রাণে শান্তি নেই, পাণ্ডেজি। ডিস্‌পেনসারি বন্ধ করবার পর ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই যদি কিছু খবর থাকে।'

পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের পানে কটাক্ষপাত করিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর তো আমরাও খুঁজে বেড়াচ্ছি, ডাক্তারবাবু, কিন্তু পাচ্ছি কৈ ? আপনি শকুন্তলা দেবী সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছিলেন তা যদি সত্য হয়—'

ডাক্তারের মুখ একটু অপ্রসন্ন হইল, 'সত্যি কিনা অন্য যে-কোনও ডাক্তার শকুন্তলাকে পরীক্ষা করলেই জানতে পারবেন।'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল, 'না না, সেকথা আমি বল্‌ছি না, সেকথা শকুন্তলা নিজেই স্বীকার করেছেন। আমরা ভাবছি দীপনারায়ণ সিং সে সময়ে মরণাপন্ন ছিলেন—'

ডাক্তার বলিলেন, 'তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিন মাস আগে দীপনারায়ণ সিং-এর অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, শহরের অনেক ডাক্তার তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা বলতে পারবেন। তাছাড়া একজন নার্স তখন অষ্টপ্রহর তাঁর কাছে থাকত। সে বলতে পারবে।'

'তাই নাকি ! কি নাম নার্সের ?'

'মিস্ ল্যাম্বার্ট। মেডিকেল কলেজের কাছে থাকে।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডেজিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি চেনেন ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চিনি না, কিন্তু বাসাটা দেখেছি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বসিয়া বসিয়া কি ভাবিল, তারপর ডাক্তার পালিতের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু, এবার আপনাকে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, কিছু মনে করবেন না। আপনি দীপনারায়ণ সিং-এর স্টেট থেকে বারো হাজার টাকা ধার নিয়েছেন কেন ?'

ডাক্তার পালিত আকাশ হইতে পড়িলেন, চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন, 'টাকা ধার নিয়েছি ! সে কি, কে বললে আপনাকে ?'

'ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশীর মুখে শুনলাম। তবে কি একথা সত্যি নয় ?'

'সর্বৈব মিথ্যে। বারো হাজার টাকা! গঙ্গাধর বংশী তো দেখছি সাংঘাতিক লোক। দীপনারায়ণবাবু মারা গেছেন এই ফাঁকে বারো হাজার টাকা হজম করতে চায়। দাঁড়ান ব্যাটাকে আমি দেখাচ্ছি, এখনি গিয়ে টুঁটি টিপে ধরব। আমার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবে, এত বড় আস্পর্ধা।'

ডাক্তার পালিত উঠিবার উপক্রম করিতেই ব্যোমকেশ বলিল, 'বসুন বসুন, ম্যানেজারের সঙ্গে বোঝাপড়া পরে করবেন।—কিন্তু কিছু সত্যি যদি না থাকে একথা উঠলো কি করে?'

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'কি করে উঠলো তা বুঝতে পেরেছি। হপ্তা দুই আগে একদিন সকালে দীপনারায়ণবাবুকে ইন্‌জেকশন দিতে গেছি, তিনি আমার মোটর দেখে বললেন—ডাক্তার, তোমার গাড়িটা ঝড়ঝড়ে হয়ে গেছে, ওটা বদলে ফ্যালো। আমি বললাম, আজকাল নতুন গাড়ি কিনতে গেলে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ, অত টাকা আমি কোথায় পাব। আমি এক পয়সা বাঁচাতে পারিনি, যা রোজগার করি সব খেয়ে ফেলি। শুনে তিনি আর কিছু বললেন না, একটু হাসলেন। আমার বিশ্বাস তিনি ওই টাকাটা আমায় দেবেন ঠিক করেছিলেন, হয়তো ম্যানেজারকে বলেও ছিলেন। তারপর তিনি যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন ম্যানেজারের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, বারো হাজার টাকা পকেটস্থ করার এই সুযোগ। দাঁড়ান না আমি ওর ভুতুড়ি বার করে ছেড়ে দেব, আমার সঙ্গে চালাকি।'

ডাক্তার পালিত শান্তশিষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু দেখিলাম তিনি চটিয়া আগুন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আর বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখা গেল না; তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং আজ রাত্রেই একটা হেস্তনেস্ত করিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ কান পাতিয়া শুনিল, ডাক্তার পালিতের মোটর চলিয়া গেল। তখন সে লাফাইয়া উঠিয়া পাণ্ডেজিকে বলিল, 'চলুন, এখনি মিস্ ল্যাম্বার্টের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

বিস্মিত পাণ্ডেজি বলিলেন, 'এখন—এই রাত্রে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যেতে হলে আজ রাত্রেই যেতে হয়। ডাক্তার পালিত যে-রকম তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, মিস্ ল্যাম্বার্টকে তালিম দিতে গেলেন কিনা বুঝতে পারছি না। চলুন।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'চলুন।'

মিস্ ল্যাম্বার্ট ইঙ্গ-ভারতীয় মহিলা। বয়স হইয়াছে। তাঁহার চেহারায় ইঙ্গ ভাবই প্রবল, চোখ কটা, রঙ ফর্সা। কিন্তু মনটি বোধহয় ভারতীয়। ডিনারের পর পান খাইয়া ঠোঁট দুটি লাল করিয়া বসিয়া রেডিও শুনিতেছিলেন, আমাদের পরিচয় পাইয়া সমাদর সহকারে ড্রয়িংরুমে বসাইলেন। ছোট্ট বাড়ির ছোট্ট ড্রয়িংরুম, বেশ ছিমছাম। মানুষটিও ছিমছাম। ডাক্তার পালিত এদিকে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল না।

মিস্ ল্যাম্বার্ট হাসিয়া বলিলেন, 'এত রাত্রে আপনাদের কি দিয়ে অতিথি সৎকার করব? পান খান।' বলিয়া পানের বাটা আমাদের সামনে খুলিয়া ধরিলেন। আমরা পান লইলাম। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনার রাত্রে কোথাও যাবার নেই তো?'

মিস্ ল্যাম্বার্ট বলিলেন, 'না, আজ আমি ফ্রী আছি।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমরা আপনার কাছ থেকে একটা কথা জানতে এসেছি। দীপনারায়ণ সিং মারা গেছেন শুনেছেন কি?'

মিস্ ল্যাম্বার্টের মুখ গম্ভীর হইল, 'শুনেছি। ডক্টর পালিতের হাতে এরকম ব্যাপার ঘটবে কল্পনা করাও যায় না।'

'আপনি কার কাছে শুনলেন?'

'ডক্টর জগন্নাথ প্রসাদের কাছে। তারপর অন্য ডক্টরদের মুখেও শুনলাম। সো স্যাড। বলুন আমি কি করতে পারি।'

পাণ্ডেজি তখন আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি প্রাঞ্জল করিয়া বলিলেন। মিস্ ল্যাম্বার্ট গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন, 'ইম্‌পসিবল। আমি দেড় মাস মিস্টার দীপনারায়ণের শুশ্রূষা করেছিলাম, তার মধ্যে কখনও দশ মিনিটের জন্যেও রুগীকে চোখের আড়াল করিনি।'

'আপনি একাই তাঁর শুশ্রূষা করতেন?'

'না, আমার একজন সহকারিণী ছিলেন—মিস্ দস্তুর। তিনি দিনের বেলা থাকতেন, আর রাত্রিতে আমি। আমাদের অনুপস্থিতি কালে কাউকে রুগীর কাছে যেতে দেওয়া হত না, এমন কি ঝি চাকরকে পর্যন্ত না।'

'হুঁ। কবে থেকে কবে পর্যন্ত আপনারা শুশ্রূষা করেছিলেন?'

'এক মিনিট, আমার ডায়েরি আপনাকে দেখাচ্ছি।'

মিস্ ল্যাম্বার্ট পাশের ঘর হইতে ডায়েরি আনিয়া পাণ্ডেজির হাতে দিলেন। ডায়েরিতে দিনের পর দিন মিস্ ল্যাম্বার্টের কর্মসূচী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে দেড় মাস দীপনারায়ণ সিং-এর জীবন লইয়া যমে মানুষে টানাটানি চলিয়াছিল তাহার বিবরণ রহিয়াছে।

রোগীর অবস্থার বর্ণনা পড়িয়া সন্দেহ থাকে না যে ওই দেড় মাস অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল। তাঁহার জীবন-শক্তি এতই হ্রাস হইয়াছিল যে বিছানায় উঠিয়া বসিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তারিখ মিলাইয়া দেখা গেল, মিস্ ল্যাম্বার্টের শুশ্রূষার কাল চার মাস আগে আরম্ভ হইয়া আজ হইতে আড়াই মাস আগে শেষ হইয়াছে। তার পরেও দীপনারায়ণ সিং অসুস্থ ছিলেন কিন্তু জীবনের আশঙ্কা তখন আর ছিল না।

ডায়েরি মিস্ ল্যাম্বার্টকে ফেরত দিয়া এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া আমরা বিদায় লইলাম।

রাত্রি সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। বাজারের দোকানপাট বন্ধ। আজ বাড়ি ফিরিয়া সত্যবতীর কাছে বকুনি খাইতে হইবে ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি ফিরিলাম। পাণ্ডেজি আমাদের নামাইয়া দিয়া গেলেন।

এগারো

পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে জানা গেল, রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন; সূর্যদেব কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। সুতরাং আমাদেরও শয্যাত্যাগ করিয়া লাভ নাই।

সাড়ে আটটার সময় সত্যবতী চা দিতে আসিয়া বলিল, 'আজ আবার অমাবস্যা। আজ কেউ বাড়ির বার হতে পাবে না।'

এমন দিনে কে বাহির হইতে চায়? কিন্তু পাণ্ডেজি শুনলেন না, ঠিক ন'টার সময় পুলিস-বেশে সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা কম্পিত কলেবরে লেপের ভিতর হইতে নির্গত হইলাম।' পাণ্ডেজি আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিলেন। বলিলেন, 'কাল রাত্রে একটা ব্যাপার ঘটেছে।'

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে ব্যোমকেশ জানিতে চাহিল, পাণ্ডেজি সংক্ষেপে ঘটনা বলিলেন—

কাল রাত্রি বারোটা হইতে আকাশে কুয়াশা জমিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি

শুরু হয়। পাণ্ডেজির দেরিতে ঘুমানো অভ্যাস ; রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় তিনি শয়নের উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। দীপনারায়ণের বাড়ি হইতে টেলিফোন, যে জমাদারকে রতিকান্ত চারজন কনস্টেবল সঙ্গে পাহারায় রাখিয়াছিল সে টেলিফোন করিতেছে। জমাদার জানাইল—কিছুক্ষণ আগে দুইজন লোক খিড়কির দরজা দিয়া হাতায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু সিপাহীরা সতর্ক ছিল, তাই প্রবেশ করিতে গিয়া সিপাহীদের দেখিয়া পলায়ন করিয়াছে। একজন সিপাহী দূর হইতে তাহাদের উপর টর্চের আলো ফেলিয়াছিল, দু'জনেই কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রশ্রেণীর লোক, কিন্তু তাহাদের সনাক্ত করা যায় নাই। মনে হয় তাহারা মোটর বাইকে চড়িয়া আসিয়াছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে দূরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গিয়াছিল।

পাণ্ডেজি রাত্রে আর কিছু করেন নাই, জমাদারকে সতর্কভাবে পাহারা দিবার উপদেশ দিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তারপর আজ সকালে খোঁজ লইয়া জানিয়াছেন যে রাত্রে আর কোনও উপদ্রব হয় নাই।

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া কিছুক্ষণ পাণ্ডেজির পানে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'নর্মদাশঙ্কর।'

ব্যোমকেশ আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'আমি ভাবছি অন্য লোকটা কে ? নর্মদাশঙ্করই যদি দুষ্মন্ত হয় তাহলে সে কি একজন বয়স্যকে সঙ্গে নিয়ে শকুন্তলার কুঞ্জে যাবে ?—পাণ্ডেজি, আপনার কি মনে হয় ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না। আমি দুটো ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি, ওয়ারেন্টে আসামীর নাম নেই, দরকার হলে বসিয়ে দেওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে চলুন, নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে হানা দেওয়া যাক। হঠাৎ আমাদের দেখলে ঘাবড়ে গিয়ে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা তৈরি হইয়া বাহির হইলাম। সত্যবতী কিছু বলিল না, কেবল কটমট করিয়া তাকাইল।

মোটরে উঠিতে গিয়া দেখিলাম ভিতরে একজন পুষ্টকায় সাব-ইন্সপেক্টর বসিয়া আছে। পাণ্ডেজি পরিচয় করাইয়া দিলেন—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী।

তিওয়ারীর চেহারা সাবেক আমলের দারোগার মত। সে পোকা-ধরা দাঁত বাহির করিয়া স্যালুট করিল। বুঝিলাম রতিকান্ত তাহাকেই থানার চার্জে রাখিয়া গিয়াছে।

এদিকে আকাশের অশ্রুবাষ্প ক্রমশ অপসৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, সদ্য-জাগ্রত সূর্যদেব শাণিত খড়্গ দিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছিলেন। এতক্ষণ যাহা ভারী মেঘের মত আকাশের বুকে চাপিয়া ছিল তাহা ধূমকুণ্ডলীর মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল। আমরা নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে পৌঁছিতে পৌঁছিতে কাঁচা সোনালী রৌদ্রে চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠিল।

নর্মদাশঙ্করের বাড়ি শহরের নূতন অংশে। ঢালাই লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা, সামনে টেনিস কোর্ট। আমরা বাহিরে মোটর রাখিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দে প্রবেশ করিলাম। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল এখনও এ বাড়ির ভাল করিয়া ঘুম ভাঙে নাই। সম্মুখের বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া একটা নিদ্রালু চাকর কয়েক জোড়া জুতা বুরুশ করিতেছে। আমাদের দেখিয়া কিছুক্ষণ মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ তাহার কাছে গিয়া টপ করিয়া এক জোড়া জুতা তুলিয়া লইল এবং উল্টাইয়া দেখিল। চাকরকে প্রশ্ন করিল, 'এ জুতো কার ?'

চাকরটা হাঁ-করা অবস্থায় বলিল, 'মালিকের।'

ব্যোমকেশ জুতা জোড়ার তলদেশ আমাদের দেখাইল। তলায় কাদা লাগিয়া আছে। রাত্রি বারোটার পর যে এই জুতা ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সময় বাড়ির ভিতর দিক হইতে একজন উচ্চশ্রেণীর উর্দিপরা বেয়ারা বাহির হইয়া আসিল। সেও দু'জন পুলিস অফিসারকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেল। পাণ্ডেজি কড়া সুরে তাহাকে বলিলেন, 'নর্মদাশঙ্করবাবু কোথায়?'

বেয়ারা ভয় পাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে, তিনি বাড়িতেই আছেন।'

'নিয়ে চল আমাদের তাঁর কাছে।'

বেয়ারা একবার একটু ইতস্তত করিল, তারপর পথ দেখাইয়া আমাদের লইয়া চলিল। বাড়ির অভ্যন্তর যতদূর দেখিলাম সুরুচির সহিত সজ্জিত। বেয়ারা আমাদের একটি দরজার সম্মুখে আনিয়া পর্দা সরাইয়া দাঁড়াইল। আমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘরের জানালা দরজা বন্ধ, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। ঘরটিকে শিকারের ঘর বলা চলে। মেঝেয় বাঘ ও হরিণের চামড়া ছড়ানো, দেয়ালে বাঘ ও হরিণের মুণ্ড। একটি কাচের আলমারিতে রাইফেল বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। ঘরের মাঝখানে একটি গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটি গদি-মোড়া আরাম-কেদারা।

আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুটি লোক মুখোমুখি দুটি কেদারায় বসিয়া আছে; তাহাদের হাতে কাচের গেলাসে রঙীন তরল পদার্থ। পাশের টেবিলে সোডা ও হুইস্কির বোতল। সুতরাং গেলাসের তরল পদার্থ যে কী বস্তু তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বোধহয় মধ্য রাত্রে যে সোমযাগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখনও চলিতেছে।

আমাদের দিকে মুখ করিয়া যে লোকটি বসিয়া ছিল সে ঘোড়া জগন্নাথ। ঘোলাটে চোখে আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহার সমস্ত শরীর বিদ্যুৎপৃষ্টের মত ঝাঁকানি দিয়া উঠিল; হাতের গেলাস হইতে তরল পদার্থ চল্‌কাইয়া পড়িল। তখন নর্মদাশঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল। তাহার আরক্ত মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। সে রূঢ় স্বরে বলিল, 'কি চাই?'

মদের বিচিত্র প্রভাব; পেটে মদ পড়িলে মানুষের চরিত্র বদলাইয়া যায়। কেহ কাঁদে, কেহ গান গায়, কেহ বা যুযুৎসু হইয়া ওঠে। নর্মদাশঙ্করের বিনীত বশংবদ ভাব আর নাই, সে উগ্র স্পর্ধিত চক্ষে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল।

পাণ্ডেজি তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে পুলিসী কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল, 'আপনাদের দু'জনের নামে ওয়ারেন্ট আছে।'

নর্মদাশঙ্কর মদের গেলাস হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল, উদ্ধত বিস্ময়ে বলিল, 'ওয়ারেন্ট! আমার নামে? কিসের ওয়ারেন্ট?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনারা দু'জনে কাল রাত্রি একটার সময় দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে ট্রেস্‌পাস করেছিলেন।'

'প্রমাণ আছে?'

পাণ্ডেজি অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'আছে। পুলিসের লোকে আপনাকে দেখেছে।'

নর্মদাশঙ্করের রক্ত-রাঙা চোখে কুটিল বজ্জাতি খেলিয়া গেল, সে ঠোঁটের একটা তেরছা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'যদি বলি শকুন্তলা আমাকে ডেকেছিল তাহলেও কি ট্রেস্‌পাস হবে?'

'সেকথা আদালতে বলবেন। —সাব-ইন্‌সপেক্টর তিওয়ারী—' পাণ্ডেজি তিওয়ারীকে ইঙ্গিত করিলেন, তিওয়ারী পকেট হইতে দুই জোড়া হাতকড়া বাহির করিল।

হাতকড়া দেখিয়া ঘোড়া জগন্নাথ হাউমাউ করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে চুপটি করিয়া ছিল,

নাক ঝাড়ার শব্দ পর্যন্ত করে নাই। এখন মদের গেলাস টেবিলে রাখিয়া দু'হাতে পাণ্ডেজির হাত চাপিয়া ধরিল, ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলিল, 'পাণ্ডেজি, দোহাই আপনার, হাতে হাতকড়া পরাবেন না। আমরা সত্যিকারের দোষ কিছু করিনি, আপনাকে সব কথা বলছি—না না, নর্মদাশঙ্কর, তুমি চুপ কর, গোঁয়ার্তুমি কোরো না—এসব কেচ্ছা জারি হয়ে পড়লে শহরে আর মুখ দেখানো যাবে না। পাণ্ডেজি, আমার বয়ান শুনুন—'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আপনি যদি সত্যি কথা বলেন শুনতে রাজী আছি।'

'সত্যি কথা বলব, কোনও কথা লুকোব না।'

'বেশ, শুনে যদি মনে হয় আপনাদের কোনও মন্দ অভিপ্রায় ছিল না, তাহলে অ্যারেস্ট নাও করতে পারি।—নর্মদাশঙ্করবাবু, আপনি যান, অনেক মদ খেয়েছেন, বিছানায় শুয়ে থাকুন গিয়ে। দরকার হলে ডাকব।'

এতক্ষণে নর্মদাশঙ্করেরও কতকটা হুঁশ হইয়াছিল ; সে আমাদের দিকে একটি ব্যর্থ ক্রোধের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদের বোতলটা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

আমরা তখন উপবেশন করিলাম। ঘোড়া জগন্নাথ কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গেলাসের বাকি মদ গলাধঃকরণ করিয়া যে ঘটনা বিবৃত করিল তাহার মর্মার্থ এইরূপ—

নর্মদাশঙ্করের সঙ্গে ঘোড়া জগন্নাথের বন্ধুত্ব খুব গাঢ় নয় ; তবে নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে আসিলে বিনা পয়সায় বিলাতি মদ পাওয়া যায়, তাই জগন্নাথ তাহার সহিত একটা বাহ্যিক সৌহৃদ্য রাখিয়াছে। কাল রাত্রে জগন্নাথ আরও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল, তারপর এখানেই আহারাদি সম্পন্ন করে। অন্যান্য বন্ধুরা প্রস্থান করিলে জগন্নাথ ও নর্মদাশঙ্কর এই ঘরে আসিয়া মদ্য পান করিতে আরম্ভ করে। নর্মদাশঙ্করকে কাল সন্ধ্যাকালে পুলিস শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় নাই, সেজন্য তাহার মনে গভীর ক্ষোভ ছিল ; মদ খাইতে খাইতে এই প্রসঙ্গই আলোচনা হয়। ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ নর্মদাশঙ্কর বলিল, আজ রাত্রে যেমন করিয়া হোক শকুন্তলার সহিত দেখা করিবে। জগন্নাথ তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে শুনিল না। তখন দুইজনে মোটর বাইকে চড়িয়া বাহির হইল, জগন্নাথ মোটর বাইকের পিছনের আসনে বসিল। দীপনারায়ণের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছিয়া তাহারা আমবাগানের মধ্যে মোটর বাইক লুকাইয়া রাখিল, তারপর খিড়কির দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু পুলিস পাহারায় ছিল, খিড়কির দরজা পার হইতে না হইতে তাহারা বৈদ্যুতিক টর্চের আলো ফেলিয়া আগন্তুক দুটিকে দেখিতে পাইল। দু'জনে তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া পলায়ন করিল এবং মোটর বাইকে চাপিয়া ফিরিয়া আসিল। তারপর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহারা এখানে বসিয়া মদ্য পান করিয়াছে। তাহাদের কোনও বে-আইনী অভিসন্ধি ছিল না, মদের ঝোঁকে একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। এখন এই সব বিবেচনা করিয়া পাণ্ডেজি নিজ গুণে তাহাদের ক্ষমা করুন।

ঘোড়া জগন্নাথের অনুনয়াক্ত বিবৃতি শেষ হইবার পর পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের দিকে ভ্রূভঙ্গ করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে নর্মদাশঙ্করবাবুর সম্বন্ধটা ঠিক কোন ধরনের ?'

জগন্নাথ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, 'দেখুন, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। মানে—'

'মানে—আপনি বলবেন না ?'

জগন্নাথ আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, 'না না, বলব না কেন ? তবে ওসব কথায় আমি থাকি না—আমি একজন রেস্‌পেক্টেবল ডাক্তার—কাজ কি আমার পরের হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে।'

'বটে! আপনি পরের হাঁড়িতে কাঠি দেন না! কেবল ডাক্তার পালিতের কম্পাউন্ডার খুবলালকে চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য ভয় দেখিয়েছিলেন।'

খুবলালের উল্লেখে ঘোড়া জগন্নাথ একবারে কেঁচো হইয়া গেল—'আমি—মানে আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা যাক। শকুন্তলার সঙ্গে নর্মদাশঙ্করের ঘনিষ্ঠতা কতদূর গড়িয়েছে তা আপনি জানেন না?'

'সত্যি বলছি নটঘটের কথা আমি কিছু জানি না।'

'কাল রাত্রে নর্মদাশঙ্কর কিছু বলেনি?'

'নর্মদাশঙ্কর ভারি মিথ্যেবাদী। ও মনে করে দুনিয়ার সব মেয়ে ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না।'

'অর্থাৎ বলেছিল। কী বলেছিল?'

'বলেছিল শকুন্তলার সঙ্গে অনেক দিন ধরে ওর প্রেম চলছে। এলাহাবাদে ওরা এক কলেজে পড়ত, তখন থেকে প্রেম।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, নীরসকণ্ঠে বলিল, 'হুঁ! আজ আপনি ছাড়া পেলেন। কিন্তু পরে হয়তো আদালতে সাক্ষী দিতে হবে। শহর ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবেন না, তাহলেই হাতে হাতকড়া পড়বে। চলুন, পাণ্ডেজি।'

বারো

দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়িতে পৌঁছিয়া পাণ্ডেজি তিওয়ারীকে বলিলেন, 'তুমি এবার থানায় ফিরে যাও, তোমাকে এখানে আর দরকার নেই।' তিওয়ারী প্রস্থান করিলে তিনি ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন, 'অতঃ কিম্?'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল, 'আসুন, সেরেস্তার দিকে যাওয়া যাক। মনে হল যেন ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে সুট করে দপ্তরখানায় ঢুকে পড়লেন।'

ফটক অতিক্রম করিয়া আমরা সেরেস্তার দিকে চলিলাম। পথে জমাদারের সঙ্গে দেখা হইল; সে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিয়া জানাইল, সব ঠিক আছে।

সেরেস্তার ঘরগুলি কাল আমরা বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম। এক সারিতে গুটি তিনেক ঘর; প্রত্যেক ঘরে তক্তপোশের উপর জাজিম পাতা। কয়েকজন কেরানী বসিয়া কাজ করিতেছে। ম্যানেজার গঙ্গাধর যখন দেখিলেন আমাদের এড়াইতে পারিবেন না, তখন তিনি সেরেস্তা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে এক তাড়া বহির্গামী চিঠি। আমাদের যেন এই মাত্র দেখিতে পাইয়াছেন এমনিভাবে মুখে একটি সচেষ্ট হাসি আনিয়া বলিলেন, 'এই যে!'

ব্যোমকেশ চিঠিগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'দেওয়ানজি, আপনার সেরেস্তা থেকে রোজ কত চিঠি ডাকে যায়?'

দেওয়ানজি চিঠিগুলি একজন পিওনের হাতে দিলেন, পিওন সেগুলি লইয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল; বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্স আছে তাহাতেই ফেলিতে গেল সন্দেহ নাই। দেওয়ানজি বলিলেন, 'তা কুড়ি-পঁচিশখানা যায়। অনেক লোককে চিঠি দিতে হয়—উকিল মোক্তার খাতক প্রজা—'

ব্যোমকেশ বলিল,'বাড়ির কোণে যে ডাক-বাক্সটা আছে তাতেই সব চিঠিপত্র ফেলা হয়?'

গঙ্গাধর বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। ও ডাক-বাক্সটা আমরা ডাক বিভাগের সঙ্গে লেখালেখি করে ওখানে বসিয়েছি। হাতের কাছে একটা ডাক-বাক্স থাকলে সুবিধা হয়।'

'তা তো বটেই। ক'বার ক্লিয়ারেন্স হয়?'

'একবার ভোর সাতটায়, একবার বিকেল চারটেয়। কিন্তু কেন বলুন দেখি? ডাক-বাক্সের সঙ্গে আপনাদের তদন্তের কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?'

'থাকতেও পারে। দেওয়ানজি, আমাদের ভাষায় এক বয়েৎ আছে—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন। কিন্তু যাক ওকথা। এদিকের খবর কি?'

গঙ্গাধর হাত উল্টাইয়া বলিলেন, 'খবর আমি তো কিছুই জানি না। এমন কি মালিকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পর্যন্ত এখনও জানতে পারিনি। সত্যিই কি ইন্‌জেকশনে বিষ ছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তারেরা তো তাই বলেছেন। ভাল কথা, ডাক্তার পালিতের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

গঙ্গাধর বংশীর মুখখানি হঠাৎ যেন চুপসিয়া গেল, চক্ষু দুটি কোটরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ঈষৎ স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'দেখা হয়েছিল। তিনি টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করছেন।'

'আপনি কি নিজের হাতে টাকা দিয়েছিলেন?'

গঙ্গাধর আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'না, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টাকা দিয়েছিল।'

'অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মানে—আপনার ছেলে লীলাধর বংশী?'

গঙ্গাধর বুজিয়া যাওয়া কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। মুশকিল হয়েছে, রসিদ নেওয়া হয়নি। ডাক্তার পালিত যে এ রকম করবেন—'

'সত্যিই তো—ভাবাও যায় না।—তা লীলাধরবাবু এখন কোথায়?'

'সে—সে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে।'

'তাই নাকি! কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে ছিলেন, দেবনারায়ণের ঘরে বসে তাড়ি খাচ্ছিলেন, আজ একেবারে শ্বশুরবাড়ি।'

গঙ্গাধর অস্পষ্ট জড়িতস্বরে বলিলেন, 'তার স্ত্রীর অসুখ...হঠাৎ খবর পেয়ে চলে গেছে।'

'হুঁ'—ব্যোমকেশের চোখে দুষ্ট-বুদ্ধি নাচিয়া উঠিল, সে তখন চিন্তা-মন্থর ভঙ্গীতে বলিল, 'টাকা তো কম নয়—বারো হাজার। স্টেটের এতগুলো টাকা মারা যাবে, দেওয়ানজি, আপনার উচিত পুলিসে এত্তেলা দেওয়া। রসিদ না দিলেও টাকা যে ডাক্তার পালিত নিয়েছেন তা পুলিস অনুসন্ধান করে বার করতে পারবে।—কি বলেন পাণ্ডেজি?'

পাণ্ডেজি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'নিশ্চয়। ম্যানেজার সাহেব বলুন, আমরা এখনি তদন্ত আরম্ভ করছি। দপ্তরের সমস্ত কাগজপত্র আমরা পরীক্ষা করে দেখব; যদি কোথাও গরমিল থাকে ধরা পড়বেই। ডাক্তার পালিত এবং লীলাধরকেও জেরা করব, তাঁদের তল্লাসী নেব—'

ব্যোমকেশ ও পাণ্ডেজি মিলিয়া ম্যানেজার সাহেবকে কোন অতট প্রপাতের কিনারায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন তাহা অনুমান করা তাঁহার মত গভীর জলের মাছের পক্ষে কঠিন নয়। তিনি উদাসভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ডাক্তার পালিত যখন অস্বীকার করছেন তখন আমিই ও-টাকা পুরিয়ে দেব। আমার লোকসানের বরাত, গচ্ছা দিতে দিতেই জন্ম কেটে গেল।' বলিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল। পাণ্ডেজি গলার মধ্যে একটা আওয়াজ করিলেন, কিন্তু

আওয়াজটা সহানুভূতিসূচক নয়।

দেওয়ানজিকে সেরেস্তায় রাখিয়া আমরা বাড়ির সদরে উপস্থিত হইলাম। বাহিরের হল-ঘরে একজন সিপাহী পাহারায় ছিল ; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, বাড়ির সবাই উপরতলায় আছে। আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া আছে চাঁদনী ; চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ, মাথার চুল এলোমেলো। তাহার চেহারা যদি স্বভাবতই মিষ্ট এবং নরম না হইত তাহা হইলে বলিতাম, রণরঙ্গিনী মূর্তি। সে আমাদের দেখিবামাত্র কোনও প্রকার ভূমিকা না করিয়া আরম্ভ করিল, 'আপনারা নাকি চাচিজির কাছে আমার যাওয়া বারণ করে দিয়েছেন! কী ভেবেছেন আপনারা ? আমি চাচিজিকে বিষ খাওয়াব ?'

অতর্কিত আক্রমণে আমরা বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। ব্যোমকেশ অসহায়ভাবে পাণ্ডেজির পানে চাহিল, পাণ্ডেজি মাথা চুলকাইয়া অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, 'দেখুন, শুধু আপনাকেই বারণ করা হয়নি, ওঁর কাছে এখন কারুরই যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর দু'চার দিনের মধ্যেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার আপনারা ওঁর কাছে যেতে পারবেন।'

চাঁদনী আবেগভরে বলিল, 'কিন্তু কেন ? আমি ওঁর যেমন সেবা করতে পারব আর কেউ কি তেমন পারবে ? তবে কেন আমাকে ওঁর কাছে যেতে দেওয়া হবে না ? উনি অসুস্থ, এতবড় শোক পেয়েছেন—'

চাঁদনীর চোখ দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। এবার পাণ্ডেজি অসহায়ভাবে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ এতক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে, সে শান্তকণ্ঠে বলিল, 'আপনি বোধহয় জানেন না, শকুন্তলা দেবী অন্তঃসত্ত্বা। তার ওপর এতবড় আঘাত পেয়েছেন। ওঁর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ, তাই মিস্ মান্নাকে ওঁর কাছে রাখা হয়েছে। আপনারা ওঁর নিজের লোক, আপনারা ওঁর কাছে বেশি যাওয়া-আসা করলে ওঁর মন আরও বিক্ষিপ্ত হবে, তাতে ওঁর শরীরের অনিষ্ট হতে পারে। তাই ওঁর কাছ থেকে কিছুদিন আপনাদের দূরে থাকাই ভাল।'

ব্যোমকেশ কথা বলিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদনী সম্মোহিতের ন্যায় স্থির চক্ষু হইয়া গিয়াছিল। ব্যোমকেশ থামিলে সে তন্দ্রাহতের মত অস্ফুট স্বরে বলিল, 'অন্তঃসত্ত্বা—' তারপর তেমনই মোহাচ্ছন্নভাবে নিজের মহলের দিকে ফিরিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনুন। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে—' চাঁদনী ফিরিয়া দাঁড়াইল—'দীপনারায়ণবাবুকে যখন ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন ?'

প্রশ্নটা চাঁদনী পুরা শুনিতে পাইল কিনা বলা যায় না, অস্পষ্টভাবে বলিল, 'ছিলাম।'

'সেখানে আর কেউ ছিল ?'

'জানি না। লক্ষ্য করিনি।'

'মন দিয়ে আমার প্রশ্ন শুনুন। ডাক্তারবাবু কি কি করলেন মনে করবার চেষ্টা করুন।'

'ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশন দিতেই চাচাজি এলিয়ে পড়লেন। তখন ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি আর একটা ইন্‌জেকশন দিলেন। আমি ছুটে গেলাম চাচিজিকে খবর দিতে। ফিরে এসে দেখি সব শেষ হয়ে গেছে।'

'ফিরে এসে সেখানে আর কাউকে দেখেছিলেন ?'

'মনে নেই। বোধহয় দেওয়ানজি ছিলেন, আর কাউকে লক্ষ্য করিনি।'—চাঁদনী আর প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া নিজের মহলে চলিয়া গেল।

ব্যোমকেশ মাটির দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে মুখ তুলিয়া বলিল, 'চলুন, এবার শকুন্তলা দেবীর ঘরে যাওয়া যাক।'

আগে আগে ব্যোমকেশ, পিছনে আমরা চলিলাম। বসিবার ঘর শূন্য, আসবাবগুলির উপর সূক্ষ্ম ধূলার আস্তরণ পড়িয়াছে। পরের ঘরটিও তাই। তৃতীয় কক্ষে, অর্থাৎ শকুন্তলার গানবাজনার ঘরের সম্মুখে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়ান, ছবিটা আর একবার দেখে নিই।'

ব্যোমকেশ ঘরে প্রবেশ করিল। আমরা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ছবি দেখিবার বিশেষ আগ্রহ আমাদের ছিল না।

যে দেয়ালে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পূর্বরাগ চিত্রটি আঁকা ছিল ব্যোমকেশ সেইদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচ মিনিট আর তাহার দেখা নাই। আমি দরজা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম সে মগ্ন-সমাহিত হইয়া ছবি দেখিতেছে। আমি একটু শ্লেষ করিয়া বলিলাম, 'কি হে, একেবারে তন্ময় হয়ে গেলে যে! কী দেখছ এত?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে ফিরিল। দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি কেমন একরকম হইয়া গিয়াছে, যেন একটা অভিভূত বিস্ময়াহত ভাব। সে আমার কথার উত্তর দিল না, মখমলের বিছানায় আসিয়া বসিল, উত্থিত হাঁটু দুটাকে বাহু দিয়া জড়াইয়া শূন্য পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া পাণ্ডেজি ও আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডেজি ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে? ছবিতে কি দেখলেন?' ব্যোমকেশ এবারও উত্তর দিল না; পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া অতি যত্নে ধরাইল, তারপর সুদীর্ঘ টান দিয়া আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

আমি পাণ্ডেজির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিলাম, তারপর দু'জনে একসঙ্গে গিয়া ছবির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। ছবি কাল যেমন দেখিয়াছিলাম, আজ দিনের আলোয় তাহার কোনও তফাৎ দেখিলাম না। শকুন্তলা তেমনি তরু-আলবালে জল সেচন করিতেছেন, দুষ্মন্ত তেমনি গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছেন। তবে ব্যোমকেশ হঠাৎ এমন বোবা হইয়া গেল কেন?

আমরা ফিরিয়া গিয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে বসিলাম এবং একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। সে সিগারেট সম্পূর্ণ শেষ করিয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল, তারপর পাণ্ডেজির হাত ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, 'একটি অনুরোধ রাখতে হবে।'

'কি অনুরোধ?'

'আমি একা শকুন্তলার ঘরে গিয়ে তাঁকে জেরা করব, সেখানে আর কেউ থাকবে না।'

'বেশ তো। কিন্তু কী পেলেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, 'সব পেয়েছি। আপনারাও তো ছবি দেখলেন, কিছু পেলেন না?'

পাণ্ডেজি ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কৈ আর পেলাম। কাল রাত্রেও ছবি দেখেছি, আজও দেখলাম, কিন্তু রহস্যের চাবি তো পেলাম না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল রাত্রে নিওন-লাইটের নীল আলোতে দেখেছিলেন, কিন্তু আজ দিনের আলোয় দেখছেন। আজ দেখতে না পাওয়ার কোনও কারণ নেই। যাহোক, আপনারা সামনের ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি।'

ব্যোমকেশ গিয়া শকুন্তলার দ্বারে টোকা দিল, দ্বার খুলিয়া মিস্ মান্না বাহিরে আসিলেন। ব্যোমকেশ নিম্নস্বরে তাঁহাকে কিছু বলিল, তিনি ঘাড় নাড়িয়া আমাদের কাছে চলিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ শকুন্তলার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তেরো

আমরা তিনজনে সামনের ঘরে গিয়া বসিলাম। মিস্ মান্না উৎসুক চোখে আমাদের পানে চাহিলেন। আমরা আর কী বলিব, নিজেরাই কিছু জানি না, মুখ ফিরাইয়া যামিনী রায়ের ছবি দেখিতে লাগিলাম।

পঁচিশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ আসিল। তাহার মুখে চোখে কঠিন ক্লান্তি, যেন বুদ্ধির যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অতি কষ্টে জয়ী হইয়াছে। সে মিস্ মান্নার পাশে বসিয়া নিম্ন কণ্ঠে তাঁহাকে নির্দেশ দিল। নির্দেশের মর্মার্থ : আজ রাত্রি সওয়া দশটা পর্যন্ত এক লহমার জন্য তিনি শকুন্তলাকে চোখের আড়াল করিবেন না, বা অন্য কাহারও সহিত জনান্তিকে কথা বলিতে দিবেন না। সওয়া দশটার পর মিস্ মান্নার ছুটি, তিনি তখন নিজের বাসায় ফিরিয়া যাইবেন। মিস্ মান্না নির্দেশ শুনিয়া পাণ্ডেজির প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, প্রত্যুত্তরে পাণ্ডেজি ঘাড় হেলাইয়া সায় দিলেন। মিস্ মান্না তখন শকুন্তলার ঘরে চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ পর্যায়ক্রমে আমার ও পাণ্ডেজির মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক হাসিল, 'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'কিন্তু—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'এখানে নয়। বাড়ি যেতে যেতে সব বলব।'

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি হইতে বাহির হইবার পূর্বে জলযোগ করিতে করিতে ব্যোমকেশ আড় চোখে সত্যবতীর পানে চাহিয়া বলিল, 'আজ আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে।'

সত্যবতী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'তা তো হবেই। আজ অমাবস্যা, তার ওপর আমি বেরুতে মানা করেছি, আজ দেরি হবে না তো কবে হবে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ অমাবস্যা নাকি! আরে, খুব লাগসৈ হয়েছে তো।'

সত্যবতী বলিল, 'হয়েছে বুঝি? ভাল।'

ব্যোমকেশ বলিল 'অজিত কবি মানুষ, ওকে জিগ্যেস কর, অভিসার করবার জন্যে অমাবস্যার রাত্রিই প্রশস্ত।'

'তা সারা রাত্রি ধরেই কি অভিসার চলবে?'

'আরে না না, বারোটা-একটার মধ্যেই ফিরব।'

সত্যবতী চকিত উদ্বেগ ভরে চাহিল, 'বারোটা-একটা?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে লঘুস্বরে বলিল, 'তুমি ভেবো না। ফিরে এসে তোমাকে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যান শোনাব। —চল, অজিত।'

সত্যবতী শঙ্কিত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, আমরা বাহির হইলাম।

আমরা পাণ্ডেজির বাসায় না গিয়া সটান দীপনারায়ণের বাড়িতে গেলাম; সেই রূপই কথা ছিল। পাণ্ডেজি বাহিরের হল-ঘরে গদি-মোড়া চেয়ারে বসিয়া দুই পা সম্মুখ দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া খাড়া হইয়া বসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'রতিকান্ত বক্সার থেকে এখনও ফেরেননি?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'না। থানায় খবর দেওয়া আছে। ফিরেই এখানে আসবে।'

অতঃপর আমরা তিনজনে বসিয়া নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। অন্ধকার হইলে পাণ্ডেজি উঠিয়া একটা আলো জ্বালিয়া দিলেন, তাহাতে ঘরের কিয়দংশ আলোকিত হইল মাত্র।...ম্যানেজার গঙ্গাধর বংশী একবার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া নিঃসাড়ে অপসৃত

হইলেন। চাঁদনী নীচে নামিয়া আসিয়া আমাদের দেখিয়া চুপি চুপি আবার উপরে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা চাকর আসিয়া তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। আমরা চা পান করিলাম।...বাড়িটা যেন ভুতুড়ে বাড়ি ; শব্দ নাই, ঘরের আনাচে কানাচে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা তিনটি প্রতীক্ষমান প্রেতাত্মার মত বসিয়া আছি ; কেন বসিয়া আছি তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

পৌনে আটটার সময় রতিকান্ত আসিল। পরিধানে আগাগোড়া পুলিস বেশ, চোখে চাপা উত্তেজনা। সে পাণ্ডেজিকে স্যালুট করিয়া তাঁহার পাশের চেয়ারের কিনারায় বসিল, পাণ্ডেজির দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, 'প্রমাণ পেয়েছি—ডাক্তার পালিতের কাজ।'

পাণ্ডেজি তীক্ষ্ণ নেত্রে রতিকান্তের পানে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, 'প্রমাণ পেয়েছ ? কি প্রমাণ—'

রতিকান্ত বলিল, 'কয়েদীটা স্বীকার করেছে। প্রথমে কিছুই বলতে চায় না, অনেক জেরা করার পর স্বীকার করল যে, পালিত তার কাছে কিউরারি কিনেছে।'

'তাই নাকি ?' পাণ্ডেজি যেন আত্ম-সমাহিত হইয়া পড়িলেন।

রতিকান্ত উৎসুকভাবে বলিল, 'তাহলে এবার বোধহয় পালিতকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে ?'

'দাঁড়াও, অত তাড়াতাড়ি নয়। একটা ছিঁচকে চোরের সাক্ষীর ওপর ডাক্তার পালিতের মত লোককে অ্যারেস্ট করা নিরাপদ নয়। এদিকে আমরাও কিছু খবর সংগ্রহ করেছি—' বলিয়া পাণ্ডেজি ব্যোমকেশের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। রতিকান্ত উচ্চকিত হইয়া ব্যোমকেশের পানে চোখে ফিরাইল, 'কি খবর ?'

'বলছি'—ব্যোমকেশ একবার সতর্কভাবে বৃহৎ কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তারপর চেয়ার টানিয়া রতিকান্তের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। আবছায়া আলোয় চারিটি মাথা একত্রিত হইল। চুপি চুপি কথা হইতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সকালবেলা শকুন্তলা দেবীকে জেরা করেছিলাম। প্রথমটা তিনি চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে অপরাধীকে তিনি চেনেন, অপরাধী তাঁর—গুপ্ত-প্রণয়ী।...' ব্যোমকেশ চুপ করিল। রতিকান্ত নির্নিমেষ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল, 'কিন্তু মুশকিল হয়েছে, কিছুতেই অপরাধীর নাম বলছেন না।'

রতিকান্ত বলিয়া উঠিল, 'নাম বলছেন না।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'না। শকুন্তলা স্ত্রীলোক, তাঁর লজ্জা সঙ্কোচ আছে, কলঙ্কের ভয় আছে, তাই তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করেও অপরাধীর নাম তাঁর মুখ থেকে বার করতে পারলাম না।'

রতিকান্ত সোজা হইয়া বসিল, ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব ? আমি যদি একলা গিয়ে তাঁকে জেরা করি, তিনি হয়তো নামটা বলতে পারেন।'

পাণ্ডেজি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'এখন আর হবে না, তিনি মুখ ফুটে কিছু বলবেন না। তবে অন্য একটা উপায় হয়েছে—'

'কি উপায় হয়েছে ?' রতিকান্ত পাণ্ডেজির দিক হইতে ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইল।

ব্যোমকেশ গলা আরও খাটো করিয়া বলিল, 'অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর শকুন্তলা রাজী হয়েছেন, চিঠি লিখে পাণ্ডেজিকে অপরাধীর নাম জানাবেন। ব্যবস্থা হয়েছে, এখানে যে-সব

পুলিস মোতায়েন আছে তাদের সরিয়ে নেওয়া হবে। শকুন্তলার কাছে থাকবেন শুধু মিস্ মান্না। আর কাউকে তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। রাত্রি সওয়া দশটার মধ্যে মিস্ মান্না শকুন্তলাকে একলা রেখে নিজের বাসায় ফিরে যাবেন। তখন শকুন্তলা চিঠি লিখে নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলে আসবেন। লোকাল চিঠি, কাল বেলা দশটা-এগারোটার সময় আমরা সে চিঠি পাব।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, চারটি মুণ্ড একত্রিত হইয়া রহিল। শেষে রতিকান্ত বলিল, 'তাহলে আপনাদের মতে ডাক্তার পালিত অপরাধী নয় ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার পালিতও হতে পারে, এখনও কিছু বলা যায় না। আবার নর্মদাশঙ্করও হতে পারে। কাল নিশ্চয় জানা যাবে।' বলিয়া সকালবেলা নর্মদাশঙ্করের বাড়িতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিল।

শুনিয়া রতিকান্ত চুপ করিয়া রহিল। পাণ্ডেজি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'আজ তাহলে ওঠা যাক। ব্যোমকেশবাবু, আপনারাও চলুন আমার বাসায়। রতিকান্ত, তুমিও চল, সবাই মিলে কেসটা আলোচনা করা যাবে। তুমি আজ সারাদিন ছিলে না, ইতিমধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা কিন্তু আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। গিন্নী ভীষণ রেগে আছেন।'

আমরা বাহিরে আসিলাম। রতিকান্ত জমাদারকে ডাকিয়া পাহারা তুলিয়া লইতে বলিল। তারপর চারজনে পাণ্ডেজির মোটরে চড়িয়া বাহির হইলাম।

বহ্নি ও পতঙ্গের কাহিনী শেষ হইয়া আসিতেছে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ কাহিনীর শেষ নাই, সারা সংসার জুড়িয়া আবহমান কাল এই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলিতেছে। কখনও পতঙ্গ তিল তিল করিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

বক্ষ্যমান বহ্নি ও পতঙ্গের খেলা শেষ হইয়া যাইবার পর আমি ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, এখানে পতঙ্গ কে ? বহ্নিই বা কে ?'

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, 'দু'জনেই বহ্নি, দু'জনেই পতঙ্গ।'

কিন্তু থাক। পরের কথা আগে বলিয়া রসভঙ্গ করিব না। সে-রাত্রে আটটা বাজিতেই ব্যোমকেশ ও আমি পাণ্ডেজির বাড়ি হইতে বাহির হইলাম ; পাণ্ডেজি ও রতিকান্ত বসিয়া কেস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। বক্সার হইতে রতিকান্ত কয়েদীর যে জবানবন্দী লিখিয়া আনিয়াছিল তাহারই আলোচনা।

বাহিরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রাস্তার ধারে আলো দু' একটা আছে বটে কিন্তু তাহা রাত্রির তিমির হরিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পাটনার পথঘাট ভাল চিনি না, এই অমাবস্যার রাত্রে চেষ্টা করিয়া কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিব এ আশা সুদূরপরাহত। আমরা মনে মনে একটা দিক-আন্দাজ করিয়া লইয়া হোঁচট খাইতে খাইতে চলিলাম। মনের এমন অগোছালো অবস্থা যে একটা বৈদ্যুতিক টর্চ আনিবার কাথাও মনে ছিল না। ভাগ্যক্রমে কিছুদূর যাইতে না যাইতে ঠুন্‌ঠুন ঝুনঝুন্ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। একটা ধোঁয়াটে আলো মন্থর গতিতে আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিলে একটি এক্কার আকৃতি অস্পষ্টভাবে রূপ পরিগ্রহ করিল। ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া হাঁকিল—'দাঁড়া। ভাড়া যাবি ?'

এক্কা দাঁড়াইল। আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া এক্কাওয়ালার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, 'না বাবু, আমার ঘোড়া থকে আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশি দূর নয়, দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ি। যাবি তো চল, বকশিস পাবি।'

এক্কাওয়ালা বলিল, 'আসুন বাবু, আমার আস্তাবল ওই দিকেই।'

আমরা এক্কার দুই পাশে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। এক্কাওয়ালা চাবুক ঘুরাইয়া মুখে টকাস টকাস শব্দ করিল। ঘোড়া ঝন্ঝন্ শব্দ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

চোদ্দ

দশ মিনিট পরে ব্যোমকেশ এক্কা থামাইতে বলিল। আমি এক্কা হইতে নামিয়া ধোঁয়াটে আলোয় ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দীপনারায়ণ সিং-এর বাড়ির কোণে ডাক-বাক্সের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। ব্যোমকেশ এক্কাওয়ালাকে ভাড়া ও বকশিস দিল।

'সালাম বাবুজি।'

অন্ধকার-সমুদ্রে ভাসমান ধোঁয়াটে আলোর একটা বুদ্বুদ ঝুনঝুন্ শব্দ করিতে করিতে দূরে মিশাইয়া গেল। আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরে নিমজ্জিত হইলাম।

'এবার কী ? দেশলাই জ্বালব ?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই চোখের উপর তীব্র আলো জ্বলিয়া উঠিল ; হাত দিয়া চোখ আড়াল করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'কে—সাব-ইন্সপেক্টর তিওয়ারী ?'

'জি।' তিওয়ারী টর্চের আলো মাটির দিকে নামাইয়া আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাটি হইতে উত্থিত আলোর ক্ষীণ প্রতিভাস আমাদের তিনজনের মুখে পড়িল। সকলের গায়ে কালো পোশাক, তিওয়ারীর কালো কোটের পিত্তলের বোতামগুলি চিক্‌মিক্ করিতেছে।

'আপনার সঙ্গে ক'জন আছে ?'

'দু'জন।' বলিয়া তিওয়ারী আলো একটু পিছন দিকে ফিরাইল। দুইটি লিকলিকে প্রেতাকৃতি পুলিস জমাদার তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ, দু'জনই যথেষ্ট। কি করতে হবে ওদের বলে দিয়েছেন ?'

'জি।'

'তাহলে এবার একে একে গাছে ওঠা যাক। অজিত, তুমি সামনের গাছটাতে ওঠো। চুপটি করে গাছের ডালে বসে থাকবে, সিগারেট খাবে না। বাঁশীর আওয়াজ যতক্ষণ না শুনতে পাও ততক্ষণ গাছ থেকে নামবে না।—তিওয়ারীজি, টর্চটা আমাকে দিন।'

টর্চ লইয়া ব্যোমকেশ একটা আম গাছের উপর আলো ফেলিল। ডাক-বাক্স হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বেশ বড় আম গাছ, গুঁড়ির স্কন্ধ হইতে মোটা ডাল বাহির হইয়াছে। গাছে পিঁপড়ের বাসা আছে কিনা জল্পনা করিতে করিতে আমি গাছে উঠিয়া পড়িলাম।

'ব্যস্, আর উঁচুতে উঠো না।'

আমি দুইটা ডালের সন্ধিস্থলে সাবধানে বসিলাম। গাছে চড়িয়া লাফালাফি করার বয়স অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, একটু ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা। সব কথা মনে আছে তো ?'

'আছে। বাঁশী শুনলেই বিরহিণী রাধার মত ছুটব।'

ব্যোমকেশ তখন অন্য তিনজনকে লইয়া পাঁচিলের সমান্তরালে ভিতর দিকে চলিল। দুই তিনটা গাছ বাদ দিয়া আর একটা গাছে একজন জমাদার উঠিল। তারপর তাহারা আরও দূরে চলিয়া গেল, কে কোন্ গাছে উঠিল দেখিতে পাইলাম না। ঘন পত্রান্তরাল হইতে কেবল

সঞ্চরমান বৈদ্যুতিক টর্চের প্রভা চোখের সামনে খেলা করিতে লাগিল।

তারপর বৈদ্যুতিক টর্চও নিভিয়া গেল।

হাতের ঘড়ি চোখের কাছে আনিয়া রেডিয়াম-নির্দেশ লক্ষ্য করিলাম—ন'টা বাজিয়া দশ মিনিট। অন্তত এক ঘণ্টার আগে কিছু ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

বসিয়া আছি। ভাগ্যে বাতাস নাই, শীতের দাঁত তাই মর্মান্তিক কামড় দিতে পারিতেছে না। তবু থাকিয়া থাকিয়া হাড়-পাঁজরা কাঁপিয়া উঠিতেছে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হইয়া যাইতেছে।

আমবাগান সম্পূর্ণ নিঃশব্দ নয়। গাছের পাতাগুলো যেন উসখুস করিতেছে, ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতেছে, অন্ধকারে শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছে তাই শুনিতে পাইতেছি। একবার মাথার উপর একটা পাখি—বোধহয় প্যাঁচা—চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, সম্ভবত গাছের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। চকিতে চোখ তুলিয়া দেখি গাছপালার ফাঁক দিয়া দুই চারিটি তারা দেখা যাইতেছে।

বসিয়া আছি। পৌনে দশটা বাজিল। সহসা সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হইয়া উঠিল। চোখে কিছু দেখিলাম না, কানেও কোনও শব্দ আসিল না, কেবল অনুভব করিলাম, আমার গাছের পাশ দিয়া কে যেন ভিতর দিকে চলিয়া গেল। কে চলিয়া গেল! পাণ্ডেজি! কিম্বা—!

একটা ভিজা-ভিজা বাতাস আসিয়া মুখে লাগিল। উর্ধ্বে চাহিয়া দেখিলাম, তারাগুলি নিষ্প্রভ হইয়া আবার উজ্জ্বল হইল। বোধহয় কাল রাত্রির মত আকাশে কুয়াশা জমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হ্যাঁ, কুয়াশাই বটে। তারাগুলিকে আর দেখা যাইতেছে না। গাছের পাতায় কুয়াশা জমিয়া জল হইয়া নীচে টোপাইতেছে—চারিদিক হইতে মৃদু শব্দ উঠিল—টপ্ টপ্ টপ্ টপ্!

প্রবল ইচ্ছা হইল ধূমপান করি। দাঁতে দাঁত চাপিয়া ইচ্ছা দমন করিলাম...

ঘড়িতে সওয়া দশটা। আমি গাছের ডালের উপর খাড়া হইয়া বসিলাম। দীপনারায়ণের হাতার ভিতর যেন একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তারপর একটা মোটর হাতা হইতে বাহির হইয়া বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। গাড়ির হেডলাইটের ছটা কুয়াশার গায়ে ক্ষণেক তাল পাকাইল, তারপর আবার অন্ধকার।

বোধহয় মিস্ মান্না নিজের বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

এইবার! দশ মিনিট স্নায়ু-পেশী শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলাম, কিছুই ঘটিল না। তারপর হঠাৎ—খিড়কির দরজার দিকে দপ্ করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পরম্পরায় তিন-চারবার পিস্তলের আওয়াজ হইল। পিস্তলের আওয়াজের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, আমি মুহূর্তকাল নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গেলাম।

চমক ভাঙিল পুলিস হুইসলের তীব্র শব্দে। আমি গাছের ডাল হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলাম। মাটি কত দূরে তাহা ঠাহর করিতে পারি নাই, সারা গায়ে প্রবল ঝাঁকানি লাগিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম খিড়কির কাছে গোটা তিনেক টর্চ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আমি সেই দিকে ছুটিলাম।

ছুটিতে ছুটিতে আর একবার পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর পায়ে শিকড় লাগিয়া আছাড় খাইলাম। উঠিয়া আবার ছুটিলাম। হাত-পা অক্ষত আছে কিনা অনুভব করিবার সময় নাই। যেখানে আর সকলেই দাঁড়াইয়াছিল হুড়মুড় করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম।

খিড়কি দরজার কাছে একটা স্থান ঘিরিয়া পাঁচজন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডেজির হাতে

রিভলবার, তিওয়ারী ও দুইজন জমাদারের হাতে টর্চ, ব্যোমকেশ কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া। তিনটি টর্চের আলো একই স্থানে পড়িয়াছে। পাঁচ জোড়া চক্ষুও সেই স্থানে নিবদ্ধ।

দুইটি মৃতদেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে ; একজন স্ত্রীলোক, অন্যটি পুরুষ। স্ত্রীলোকটি শকুন্তলা, আর পুরুষ—রতিকান্ত।

রতিকান্তের নীল চক্ষু দুটা বিস্ময় বিস্ফারিত ; ডান হাতের কাছে একটা পিস্তল পড়িয়া আছে, বাঁ হাতের আঙুলগুলা একটা সাদা রঙের খাম আঁকড়াইয়া আছে। শকুন্তলার মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না। গায়ে কালো রঙের শাল জড়ানো। বুকের কাছে থোলো থোলো রক্ত-করবীর মত কাঁচা রক্ত।

ব্যোমকেশ নত হইয়া রতিকান্তের আঙুলের ভিতর হইতে খামটা বাহির করিয়া লইয়া নিজের পকেটে পুরিল।

পনের

পাণ্ডেজির বাড়িতে নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ। অতিথির সংখ্যা বাড়িয়াছে ; ডাক্তার পালিত, মিস্ মান্না, ব্যোমকেশ ও আমি। টেবিল ঘিরিয়া খাইতে বসিয়াছি। আহার্য দ্রব্যের মধ্যে প্রধান—মুর্গীর কাশ্মীরী কোর্মা।

ব্যোমকেশ এক টুকরা মাংস মুখে দিয়া অর্ধ-নিমীলিত চক্ষে আস্বাদ গ্রহণ করিল, তারপর গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'পাণ্ডেজি, আমি চুরি করব।'

পাণ্ডেজি হাসিমুখে ভ্রূ তুলিলেন, 'কী চুরি করবেন ?'

'আপনার বাবুর্চিকে।'

পাণ্ডেজি হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, 'অসম্ভব।'

'অসম্ভব কেন ?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমার বাবুর্চি আমি নিজেই।'

'অ্যাঁ—এই অমৃত আপনি রেঁধেছেন! তবে আর আপনার পুলিসের চাকরি করার কি দরকার ? একটি হোটেল খুলে বসুন, তিন দিনে লাল হয়ে যাবেন।'

কিছুক্ষণ হাস্য-পরিহাস চলিবার পর মিস্ মান্না বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আমাকে কিন্তু আপনারা ফাঁকি দিয়েছেন। সে হবে না, সব কথা আগাগোড়া বলতে হবে। কি করে কি হল সব বলুন, আমি শুনব।'

ডাক্তার পালিত বলিলেন, 'আমিও শুনব। এ ক'দিন আমি আসামী কিনা এই ভাবনাতেই আধমরা হয়ে ছিলাম। এবার বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন মুখ চলছে। খাওয়ার পর বলব।'

আকণ্ঠ আহার করিয়া আমরা বাহিরে আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ গড়গড়ার নল হাতে লইল, ডাক্তার পালিত একটি মোটা চুরুট ধরাইলেন।

মিস্ মান্না জর্দা মুখে দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, 'এবার আরম্ভ করুন।'

ব্যোমকেশ গড়গড়ার নলে কয়েকটি মন্দ-মন্থর টান দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল।

'এই ঘরেই রতিকান্তকে প্রথম দেখেছিলাম। পাণ্ডেজিকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। সুন্দর চেহারা, নীল চোখ। দীপনারায়ণ সিং-এর উদ্দেশ্যে হাল্কা ব্যঙ্গ করে বলেছিল—বড় মানুষ কুটুম্ব। তখন জানতাম না ওই হাল্কা ব্যঙ্গের আড়ালে কতখানি বিষ লুকিয়ে আছে।

তখন কিছুই জানতাম না, তাই 'কুটুম্ব' কথাটাও কানে খোঁচা দিয়ে যায়নি। এখন অবশ্য জানতে পেরেছি শকুন্তলা আর রতিকান্তের মধ্যে একটা দূর সম্পর্ক ছিল ; দু'জনেরই বাড়ি প্রতাপগড়ে, দু'জনেই পড়ে-যাওয়া ঘরানা ঘরের ছেলে মেয়ে, দু'জনে বাল্য প্রণয়ী।

'রতিকান্ত সে-রাত্রে আমার পরিচয় জানতে পারেনি, পাণ্ডেজি কেবল বলেছিলেন,—আমার কলকাতার বন্ধু। তাতে তার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি। যদি সে-রাত্রে সে জানতে পারত যে অধমের নাম ব্যোমকেশ বক্সী তাহলে সে কি করত বলা যায় না, হয়তো প্ল্যান বদলে ফেলত। কিন্তু তার পক্ষে মুশকিল হয়েছিল এই যে, পেছুবার আর সময় ছিল না, একেবারে শিরে সংক্রান্তি এসে পড়েছিল।

'শকুন্তলা আর রতিকান্তর গুপ্ত-প্রণয়ের অতীত ইতিহাস যত দূর আন্দাজ করা যায় তা এই। ওদের বিয়ের পথে সামাজিক বাধা ছিল, তাই ওদের দুরন্ত প্রবৃত্তি সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে গুপ্ত-প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিল ; ওদের উগ্র অসংযত মন আধুনিক স্বৈরাচারের সুযোগ নিয়েছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু তবু সবই চুপি চুপি। নৈতিক লজ্জা না থাক, লোকলজ্জার ভয় ছিল ; তার উপর 'চোরি পিরিতি লাখগুণ রঙ্গ'। লুকিয়ে প্রেম করার মধ্যে একটা তীব্র মাধুর্য আছে।

'তারপর একদিন দীপনারায়ণ শকুন্তলাকে দেখে তার রূপ-যৌবনের ফাঁদে পড়ে গেলেন। শকুন্তলা দীপনারায়ণের বিপুল ঐশ্বর্য দেখল, সে লোভ সামলাতে পারল না। তাঁকে বিয়ে করল। কিন্তু রতিকান্তকেও ছাড়ল না। রতিকান্তর বিয়েতে মত ছিল কিনা আমরা জানি না। হয়তো পুরোপুরি ছিল না, কিন্তু শকুন্তলাকে ত্যাগ করাও তার অসাধ্য। শকুন্তলা বিয়ের পর যখন পাটনায় এল তখন রতিকান্তও যোগাড়যন্ত্র করে পাটনায় এসে বসল, বোধহয় মোহান্ধ দীপনারায়ণ সাহায্য করেছিলেন। ফলে ভিতরে ভিতরে আবার রতিকান্তর আর শকুন্তলার আগের সম্বন্ধ বজায় রইল। বিয়েটা হয়ে রইল ধোঁকার টাটি।

'কুটুম্ব হিসাবে রতিকান্ত দীপনারায়ণের বাড়িতে যাতায়াত করত, কিন্তু প্রকাশ্যে শকুন্তলার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখাত না। তাদের সত্যিকারের দেখা সাক্ষাৎ হত সকলের চোখের আড়ালে। শকুন্তলা চিঠি লিখে গভীর রাত্রে নিজের হাতে ডাক-বাক্সে ফেলে আসত ; রতিকান্ত নির্দিষ্ট রাত্রে আসত, খিড়কির দরজা দিয়ে হাতায় ঢুকত, তারপর লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেত। শকুন্তলা দোর খুলে প্রতীক্ষা করে থাকত—

'এইভাবে চলছিল, হঠাৎ প্রকৃতিদেবী বাদ সাধলেন। দীপনারায়ণের যখন গুরুতর অসুখ ঠিক সেই সময় শকুন্তলা জানতে পারল সে অন্তঃসত্ত্বা। এখন উপায় ? অন্য সকলের চোখে যদি বা ধুলো দেওয়া যায়, দীপনারায়ণের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। দু'জনে মিলে পরামর্শ করল তাড়াতাড়ি দীপনারায়ণকে সরাতে হবে ; নইলে মান-ইজ্জত রাজ-ঐশ্বর্য কিছুই থাকবে না, গালে চুন কালি মেখে ভদ্রসমাজ থেকে বিদায় নিতে হবে।

'মৃত্যু ঘটাবার এই চোস্ত ফন্দিটা রতিকান্তের মাথা থেকে বেরিয়েছিল সন্দেহ নেই। দৈব যোগাযোগও ছিল ; এক শিশি কিউরারি একটা ছিঁচকে চোরের কাছে পাওয়া গিয়েছিল। সেটা যখন রতিকান্তর হাতে এল, রতিকান্ত প্রথমেই খানিকটা কিউরারি সরিয়ে ফেলল। তারপর যথাসময়—রতিকান্ত নিজেই ডাক্তারবাবুর ডিস্‌পেনসারির তালা ভেঙে লিভারের ভায়াল বদলে রেখে এল, তারপর নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে। সকলেই ভাবলে ছিঁচকে চোরের কাজ।

'সেই রাত্রেই রতিকান্ত আমার নাম জানতে পারল। অনুবাদের কল্যাণে হিন্দী শিক্ষিত সমাজে আমার নামটা অপরিচিত নয়। রতিকান্ত ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তখন আর উপায় নেই,

হাত থেকে তীর বেরিয়ে গেছে।

'পরদিন সকালে ডাক্তারবাবু ইন্‌জেকশন দিলেন, দীপনারায়ণের মৃত্যু হল। রতিকান্ত ভেবেছিল, কিউরারি বিষের কথা কারুর মনে আসবে না, সবাই ভাববে লিভার ইন্‌জেকশনের শকে মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তারবাবুও প্রথমে তাই ভেবেছিলেন, কিন্তু যখন কিউরারির কথা উঠল তখন তাঁর খটকা লাগল। তিনি বললেন,—হতেও পারে।

'রতিকান্ত আগে থাকতে ঘাবড়ে ছিল, এখন সে আরও ঘাবড়ে গিয়ে একটা ভুল করে ফেললে। এই বোধহয় তার একমাত্র ভুল। সে ভাবল, দীপনারায়ণের শরীরে নিশ্চয় কিউরারি পাওয়া যাবে ; এখন যদি লিভারের ভায়ালে কিউরারি না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের সন্দেহ হবে ডাক্তার পালিতই ভায়াল বদলে দিয়েছেন। রতিকান্তের কাছে একটা নির্বিষ লিভারের ভায়াল ছিল, যেটা সে ডাক্তার পালিতের ব্যাগ থেকে বদলে নিয়েছিল। সে অ্যানালিসিসের জন্যে সেই নির্বিষ ভায়ালটা পাঠিয়ে দিলে।

'যখন জানা গেল ভায়ালে বিষ নেই তখন ভারি ধোঁকা লাগল। শরীরে বিষ পাওয়া গেছে অথচ ওষুধে বিষ পাওয়া গেল না, এ কি রকম ? দীপনারায়ণের মৃত্যুর পর কেবল তিনজনের হাতে ভায়ালটা গিয়েছিল—ডাক্তার পালিত, পাণ্ডেজি আর রতিকান্ত। পাণ্ডেজি আর রতিকান্ত পুলিসের লোক ; সুতরাং ডাক্তারবাবুরই কাজ, তিনি এই রকম একটা গোলমেলে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে পুলিসের মাথা গুলিয়ে দিতে চান। কিন্তু ডাক্তার পালিতের মোটিভ কি ?

'ইতিমধ্যে দুটো মোটিভ পাওয়া গিয়েছিল—টাকা আর গুপ্ত-প্রেম। গুপ্ত-প্রেমের সন্দেহটা ডাক্তার পালিতই আমাদের মনে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যদি গুপ্ত-প্রেমই আসল মোটিভ হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে, শকুন্তলার দুষ্মন্ত কে ? আর যদি টাকা মোটিভ হয় তাহলে তিনজনের ওপর সন্দেহ—দেবনারায়ণ, চাঁদনী আর গঙ্গাধর বংশী। শকুন্তলাও কলঙ্ক এড়াবার জন্যে লোক লাগিয়ে স্বামীকে খুন করতে পারে। এদের মধ্যে যে-কেউ ডাক্তার পালিতকে মোটা টাকা খাইয়ে নিজের কাজ হাসিল করে থাকতে পারে। একুনে সন্দেহভাজনের সংখ্যা খুব কম হল না ;-দেবানারায়ণ থেকে নর্মদাশঙ্কর, ঘোড়া জগন্নাথ সকলেরই কিছু না কিছু স্বার্থ আছে।

'রতিকান্ত কিন্তু উঠে-পড়ে লেগেছিল দোষটা ডাক্তার পালিতের ঘাড়ে চাপাবে। সে বক্সারে গিয়ে কয়েদীর কাছ থেকে জবানবন্দী লিখিয়ে নিয়ে এল। আমরা জানি এ-ধরনের কয়েদীকে হুম্‌কি দিয়ে বা লোভ দেখিয়ে পুলিস যে-কোনও জবানবন্দী আদায় করতে পারে। তাই আমরা রতিকান্তের মতলব বুঝে মনে মনে হাসলাম। রতিকান্তই যে অপরাধী তা আমরা তখন জানতে পেরেছি।

'অন্যদিকে ছোটখাটো দু' একটা ব্যাপার ঘটছিল। পিতা-পুত্র গঙ্গাধর আর লীলাধর মিলে বারো হাজার টাকা হজম করবার তালে ছিল। ওদিকে নর্মদাশঙ্কর দীপনারায়ণের মৃত্যুতে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল, ভেবেছিল শকুন্তলার হৃদয়ের শূন্য সিংহাসন সেই এবার দখল করবে। সে জানত না যে শকুন্তলার হৃদয়-সিংহাসন কোনওকালেই শূন্য হয়নি।

'হঠাৎ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, শকুন্তলার দুষ্মন্ত কে তা জানতে পারলাম। শকুন্তলা দেয়ালে একটা ছবি এঁকেছিল। সেকালে শকুন্তলার পূর্বরাগের ছবি। প্রথম যে-রাত্রে ছবিটা দেখি সে-রাত্রে কিছু বুঝতে পারিনি, নীল আলোয় ছবির নীল-রঙ চাপা পড়ে গিয়েছিল। পরদিন দিনের আলোয় যখন ছবিটা দেখলাম এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। যেন কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে ছিল, হঠাৎ কুয়াশা ফুঁড়ে সূর্য বেরিয়ে এল। ছবিতে দুষ্মন্তের চোখের মণি নীল।

'প্রেম বড় মারাত্মক জিনিস। প্রেমের স্বভাব হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা,

সকলকে ডেকে জানানো—আমি ওকে ভালবাসি। অবৈধ প্রেম তাই আরও মারাত্মক। যেখানে পাঁচজনের কাছে প্রেম ব্যক্ত করবার উপায় নেই সেখানে মনের কথা বিচিত্র ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। শকুন্তলা ছবি এঁকে নিজের প্রেমকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল। ছবিতে দুষ্মন্তের চেহারা মোটেই রতিকান্তের মত নয়, কিন্তু তার চোখের মণি নীল। 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান !' অজিত আর পাণ্ডেজিও ছবি দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরা নীলচোখের ইশারা ধরতে পারেননি।

'এই ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যত লোক আছে তাদের মধ্যে কেবল রতিকান্তরই নীল চোখ। সুতরাং রতিকান্তই শকুন্তলার প্রচ্ছন্ন প্রেমিক। মোটিভ এবং সুযোগ, বুদ্ধি এবং কর্ম-তৎপরতা সব দিক দিয়েই সে ছাড়া আর কেউ দীপনারায়ণের মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়।

'কিন্তু তাকে ধরব কি করে ? শুধু নীল-চোখের প্রমাণ যথেষ্ট নয়। একমাত্র উপায়, যদি ওরা নিভৃতে পরস্পর দেখা করে, যদি ওদের এমন অবস্থায় ধরতে পারি যে অস্বীকার করবার পথ না থাকে।

'ফাঁদ পাতলাম। আমি একা শকুন্তলার সঙ্গে দেখা করে স্পষ্ট ভাষায় বললাম—তোমার দুষ্মন্ত কে তা আমি জানতে পেরেছি এবং সে কি করে দীপনারায়ণকে খুন করেছে তাও প্রমাণ দিতে পারি। কিন্তু আমি পুলিস নয় ; তুমি যদি আমাকে এক লাখ টাকা দাও তাহলে আমি তোমাদের পুলিসে ধরিয়ে দেব না। আর যদি না দাও পুলিসে সব কথা জানতে পারবে। বিচারে তোমাদের দু'জনেরই ফাঁসি হবে। শকুন্তলা কিছুতেই স্বীকার করে না কিন্তু দেখলাম ভয় পেয়েছে। তখন বললাম—তোমাকে আজকের দিনটা ভেবে দেখবার সময় দিলাম। যদি এক লাখ টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে রাজী থাকো, তাহলে আজ রাত্রে আমার নামে একটা চিঠি লিখে, নিজের হাতে ডাক-বাক্সে দিয়ে আসবে। চিঠিতে স্রেফ একটি কথা লেখা থাকবে—হাঁ। রাত্রি দশটার পর মিস্ মান্নাকে এখান থেকে সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা আমি করব, রাত্রে হাতায় পুলিস পাহারাও থাকবে না। যদি কাল তোমার চিঠি না পাই, আমার সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাণ্ডেজির হাতে সমর্পণ করব।

'ভয়-বিবর্ণ শকুন্তলাকে রেখে আমি চলে এলাম, মিস্ মান্না তার ভার নিলেন। এখন শুধু নজর রাখতে হবে শকুন্তলা আড়ালে রতিকান্তের সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ না পায়। তারপর আমি পাণ্ডেজির সঙ্গে পরামর্শ করে বাকি ব্যবস্থা ঠিক করলাম। রাত্রে রতিকান্ত বক্সার থেকে ফিরলে তাকে এক নতুন গল্প শোনালাম, তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডেজির এখানে এলাম।

'আমি আর অজিত সকাল সকাল এখান থেকে বেরিয়ে দীপনারায়ণের বাড়ির পাশে আমবাগানে গেলাম ; তিওয়ারী দু'জন লোক নিয়ে উপস্থিত ছিল, সবাই আম গাছে উঠে লুকিয়ে রইলাম। এদিকে পাণ্ডেজি রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত রতিকান্তকে আটকে রেখে ছেড়ে দিলেন, আর নিজে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্ধকারে গাছের ডালে বসে শিকারের প্রতীক্ষা আরম্ভ হল।

'আমি ছিলাম খিড়কির দরজার কাছেই একটা গাছে। পাণ্ডেজি এসে আমার পাশের গাছে উঠেছিলেন। নিঃশব্দ অন্ধকারে ছয়টি প্রাণী বসে আছি। দশটা বাজল। আকাশে কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছিল ; গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ শব্দে জল পড়তে লাগল। তারপর মিস্ মান্না মোটরে বাড়ি চলে গেলেন।

'রতিকান্ত কখন এসেছিল আমরা জানতে পারিনি। সে বোধ হয় একটু দেরি করে এসেছিল ; পাণ্ডেজির কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে নিজের বাসায় গিয়েছিল, সেখান থেকে

পিস্তল নিয়ে আমবাগানে এসেছিল।

'রতিকান্তের চরিত্র আমরা একটু ভুল বুঝেছিলাম—যেখানেই দেখা যায় দু'জন বা পাঁচজন একজোট হয়ে কাজ করছে সেখানেই একজন সর্দার থাকে, বাকি সকলে তার সহকারী। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ভেবেছিলাম শকুন্তলাই নাটের গুরু, রতিকান্ত সহকারী। আসলে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। রতিকান্তের মনটা ছিল হিংস্র শ্বাপদের মত, নিজের প্রয়োজনের সামনে কোনও বাধাই সে মানত না। সে যখন শুনল যে শকুন্তলা চিঠি লিখে অপরাধীর নাম প্রকাশ করে দিতে রাজী হয়েছে তখনই সে স্থির করল শকুন্তলাকে শেষ করবে। তার কাছে নিজের প্রাণের চেয়ে প্রেম বড় নয়।

'আমরা ভেবেছিলাম রতিকান্ত শকুন্তলাকে বোঝাতে আসবে যে শকুন্তলা যদি অপরাধীর নাম প্রকাশ না করে তাহলে কেউ তাদের ধরতে পারবে না, শাস্তি দিতেও পারবে না। আমাদের প্ল্যান ছিল, যে-সময় ওরা এই সব কথা বলাবলি করবে ঠিক সেই সময় ওদের ধরব।

'রতিকান্ত কিন্তু সে-ধার দিয়ে গেল না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করেছিল অনিষ্টের জড় রাখবে না, সমূলে নির্মূল করে দেবে।

'শকুন্তলা কখন চিঠি হাতে নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুল আমরা জানতে পারিনি, চারিদিকের টপ্ টপ্ শব্দের মধ্যে তার পায়ের আওয়াজ ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু রতিকান্ত বোধহয় দোরের পাশেই ওৎ পেতে ছিল, সে ঠিক শুনতে পেয়েছিল। হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে দপ্ করে টর্চ জ্বলে উঠল, সেই আলোতে শকুন্তলার ভয়ার্ত মুখ দেখতে পেলাম। ওদের মধ্যে কথা হল না, কেবল কয়েকবার পিস্তলের আওয়াজ হল। শকুন্তলা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'আমার কাছে পুলিস হুইস্‌ল ছিল, আমি সেটা সজোরে বাজিয়ে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। পাণ্ডেজিও গাছ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁর বাঁ হাতে টর্চ, ডান হাতে রিভলবার।

'রতিকান্ত নিজের টর্চ নিভিয়ে দিয়েছিল। পাণ্ডেজির টর্চের আলো যখন তার গায়ে পড়ল তখন সে পিস্তল পকেটে রেখে হাঁটু গেড়ে শকুন্তলার হাত থেকে চিঠিখানা নিচ্ছে। আহত বাঘের মত সে ফিরে তাকাল, তারপর বিদ্যুৎবেগে পকেট থেকে পিস্তল বার করল।

'কিন্তু পিস্তল ফায়ার করবার অবকাশ তার হল না; পাণ্ডেজির রিভলবারে একবার আওয়াজ হল—'

ব্যোমকেশ থামিলে ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ডাক্তার পালিতের চুরুট নিভিয়া গিয়াছিল, তিনি সেটা আবার ধরাইলেন। মিস্ মান্না একটা কম্পিত নিশ্বাস ফেলিলেন।

'শকুন্তলা ভাল মেয়ে ছিল না। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। সে সম্মোহন মন্ত্র জানত।—চাঁদনী এখনও বিশ্বাস করে না যে শকুন্তলা দোষী।—'

আমি বলিলাম, 'ওদের জীবিত ধরতে পারলেই বোধহয় ভাল হত—'

পাণ্ডেজি মাথা নাড়িলেন, 'না, এই ভাল।'